যাজ্ঞবল্ক্য। তাহা হইলে পরমাত্মা 'আমি', 'তুমি', 'ইনি', 'তিনি' এই সকল ব্যক্তিভেদেরও অতীত?

মৈত্রেয়ী। এই বিষয়টা ঠিক বুঝিতে পারি না।

কাত্যায়নী। আমিও বুঝিতে পারি না।

যাজ্ঞবল্ক্য। কঠিনতা কোথায়?

মৈত্রেয়ী। 'আমি' 'তুমি' এই সকল ব্যক্তি; পরমাত্মাও ব্যক্তি; তিনি ব্যক্তিভেদের অতীত কিরূপে হইবেন?

যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি ব্যক্তি, তিনি পুরুষ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব অসীম, আমাদের ব্যক্তিত্ব সসীম।

কাত্যায়নী। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

যাজ্ঞবল্ক্য। আমার ব্যক্তিত্ব তোমার ব্যক্তিত্বের বাহিরে, তোমার ব্যক্তিত্ব আমার ব্যক্তিত্বের বাহিরে। কিন্তু পরমাত্মার ব্যক্তিত্বে অন্তর বাহির ভেদ বা পরিচ্ছেদ নাই।

মৈত্রেয়ী। তাহা হইলে আমার ব্যক্তিত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত?

যাজ্ঞবল্ক্য। নিশ্চয়ই; কারণ তিনি আমার আত্মা।

মৈত্রেয়ী। তবে প্রত্যেক জীবের ব্যক্তিত্বই তাঁহার ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত?

যাজ্ঞবল্ক্য। নিশ্চয়ই। পূর্ব্বে যে সকল কথা হইয়াছে তাহাতে ত এই কথা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে।

মৈত্রেয়ী। তাহা সত্য; কিন্তু ব্যক্তিত্বের বেড়টা যেন অভঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। অথচ আমরা প্রত্যেকে একই অখণ্ড অনন্ত বস্তুকে নিজ আত্মা বলিয়া জানিতেছি, সুতরাং ব্যক্তিভেদে আত্মা ভিন্ন হইতে পারেন না, একই আত্মা সকল ব্যক্তিত্বের আশ্রয়, এই সত্যও অকাট্য বলিয়া বোধ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য। ব্যক্তিত্বের বেড় অভঙ্গ হইলে আর আমরা অনন্ত অখণ্ড সর্ব্ব দেশকালের আধার পরমাত্মাকে ভাবিতে পারিতাম না। তিনি আমাদের আত্মারূপে আছেন, আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাতেই আমরা অসীমকে জানিতেছি, অসীমের ধারণা করিতেছি।

মৈত্রেয়ী। কি অদ্ভুত সত্য! পরমাত্মা একদিকে জীবের অনায়ত্ত, বুদ্ধিমনের অগোচর হইয়াও আর একদিকে জীবের আত্মারূপী, জীবের চির নিকটস্থ। এই সত্যের আভাস মাত্রে আমার চিত্ত আনন্দে বিহ্বল হইতেছে। আমি কিয়ৎক্ষণ এই সত্যের ধ্যান করি।

মৈত্রেয়ীর বিজ্ঞানাত্মা আনন্দস্বরূপে মগ্ন হইল। কাত্যায়নী আলোচনার এতটুকু অনুসরণ করিতে সমর্থা হইলেন যে তিনি অন্য দিনের মত সহজে নিদ্রা ও অবসাদ-গ্রস্তা হইলেন না। কিন্তু মৈত্রেয়ী ধ্যানস্থ হইবার পর আর অধিকক্ষণ তিনি তপোগৃহে থাকিতে পারিলেন না। ইঙ্গিতে স্বামীকে বিশ্রামের ইচ্ছা জানাইয়া স্বামীসহ বিশ্রামগৃহে প্রবিষ্টা হইলেন। মৈত্রেয়ী আনন্দে লীনা। কাত্যায়নী ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্তা ছাড়িয়া শীঘ্রই স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীজনোচিত সামান্য আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। যাহা হউক, ইহাতে কাত্যায়নীর সদৃশ সাধক সাধিকাদিগের নিরাশ হইবার কারণ নাই; বদ্ধ জীব মুমুক্ষু হইলেও সাময়িক উত্থান পতনের অধীন।

স্বরলিপি।

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

		॥ ০	১	২´
গা মা	II {	র্ণা ণদা দা।	পা পা পা।	মা পদা মপা I
আম্ রা	{	প থে৽ প	থে যা ব	সা রে৽ সা

৩ ৩ ০
(মগা গা মা) } I মগা না না I না র্সা র্সর্ঋা ।
রে॰ আম্ রা রে॰ তো মার্ নাম্ গে রে॰

১ ২´ ৩
। না র্সনা দা । পা পদঃ ণঃ দা । পা মগা মা II
ফি রি॰ ব ছা রে॰ ॰ ছা রে "আম্ রা"

০ ১ ২´ ৩
II { দা দা দা । দা না র্সা । র্সর্গর্ঙ্গা র্ঙ্গা র্ঋঃ র্সনঃ । র্সা -া -া I
বল্ ব ত ন নী রে কি দি বি ॰॰ দা ॰ ন্

০ ১ ২´ ৩ m
I র্সর্গর্ঙ্গা র্ঙ্গা র্ঙ্গা । র্ঙ্গা র্ঋা র্সর্ঋা । না সা র্সর্ঋা । নর্সাঃদঃ -া } I
কে দি বি ধন্ তো রা॰ কে দি বি॰ প্রা ॰ ণ্

০ ১ ২´ ৩
I দনর্সর্ঋা র্ঋা র্সা । না র্সান দা । পা পদঃ ণঃ দা । পা মগা মা II
মা ডে কে ছে ক ব বা রে॰ ॰ বা রে 'আম্ রা'

০ ১ ২´ ৩ m
II সা সদা দা । দা পা পা । পমা পা পদা । মপা মঙ্গা -া I
তো মার্ না মে প্রা ণের্ স॰ ক ল॰ সু ॰॰ র্

০ ১ ২´ ৩
I মা পা পদা । মপা মঙ্গা ঙ্গা । ঙ্গমা ঙ্গা ঋা । সা -া -া I
আপ্ নি উঠ্ বে বে॰ জে সু ধা ম ধু ॰ র্

০ ১ ২´
I { দসা দা ণ্া । সা সঋঙ্গা ঙ্গা । ঋঙ্গা ঋা ঋা ।
হৃ দ য় যন্ ত্রে রি তা রে তা

৩ ৩ ০
। (সা ঋা সঃঋসঃ) } I সা -া -া I I { পদণা ণদা দা ।
রে আ মা॰র রে ॰ ॰ বে লা॰ গে

১ ২´ ৩
দা না র্সা । র্সর্গর্ঙ্গা র্ঋঃর্ঙ্গঃর্ঋঃ র্সনা । র্সা -া র্সা I
লে ত থন্ তো মা ॰ ॰ রি॰ পা ॰ রে

০	১	২´	৩ m
I সণর্গা র্গা র্গা।	র্গা র্ঋা সর্ঋা।	না র্সা সর্ঋ।	নর্সাঃ দঃ দা} II
এ নে দে	ব স বা য়	পূ জা কু •	ড়া • য়ে
০	১	২´	৩
I দনর্সর্ঋা র্সা সর্ঋা।	নর্সাঃ নঃ দপা।	পা পদণা দা।	পা মগা মা II
স স্তা নে •	রি দা • ন্	ভা রে ভা	রে "আম্ রা"

শ্রীউপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী।

প্রাচীন ও নব্য ভারতে নারীজাতির অবস্থা।

(শ্রীমতী কমলা সত্থিয়ানাধন এম, এ,-লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।)

কোন জাতিবিশেষ সভ্যতার কোন্ স্তরে অবস্থিতি করিতেছে, সেই জাতির নারীগণের অবস্থা আলোচনা করিলেই তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতে নারীজাতির অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল। গ্রীস ও রোম যখন গৌরবের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তখনও এ বিষয়ে ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। রাজা বা দেশের প্রতি কর্ত্তব্যই প্রাচীন গ্রীক জীবনে সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য ছিল। পারিবারিক বন্ধন এই কর্ত্তব্য সাধনে অন্তরায় স্বরূপ হইতে পারে, এই জন্য নারীগণকে সকল উচ্চাধিকার ইহাতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। সুশিক্ষায় বঞ্চিত ও কঠোর অবরোধে বাস করিয়া গ্রীক-রমণীগণ ক্রীতদাসীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোম-রমণীগণের অবস্থাও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল না। প্রাচীন রোমীয় রমণীকে মহৎ ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ রূপে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তাহাদেরও কোন ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না, তাহারাও দাসীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অধীন ছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল।

এই বিষয়ে বেদই প্রাচীনতম প্রামাণিক সাক্ষী। কিন্তু বেদ হইতে আমরা এ বিষয়ে সাক্ষাৎ ভাবে বেশী কিছু জানিতে পারি না। তবে যতটুকু অবগত হওয়া হওয়া যায় তাহাতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক সময়ে আর্য্যনারীর অবস্থা অতি সম্মানিত, অতি গৌরবময় ছিল। সে সময়ে তাঁহাদের কার্য্যে কেহ কোন অন্যায় প্রতিবন্ধক স্থাপন করিত না। তাঁহারা সমাজে উন্মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নারীদিগকে অশিক্ষিতা রাখিবার জন্য তখন কোন চেষ্টা করা হইত না, এবং সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বামীর সমাবস্থাপন্না ছিলেন, তাঁহাদিগকে কাহারও,—এমন কি শাশুড়ীরও অধীনতা স্বীকার করিতে হইত না। হিন্দুনারী জ্ঞানালোচনায় তখন স্বামীর সহযোগিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট তিনি প্রচুর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইতেন এবং পত্নী ও মাতারূপে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা এই প্রকার উন্নত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে এই উন্নত অবস্থার কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় এবং এদেশের সভ্যতা ও উন্নতির পথে প্রবল বাধাস্বরূপ তাহা সকলেই স্বীকার করেন; ভারতের গৌরব লইয়া যাহারা নিতান্ত আস্ফালন করেন তাঁহারাও একথা অস্বীকার করিতে পারেন না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বৈদিক সময়ের প্রথম ভাগে হিন্দুনারীর অবস্থা অতি উন্নত ছিল, তাঁহারা স্বামীর সহিত সকল বিষয়েই সমান অধিকার পাইতেন। বেদে

অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই পত্নীগণ স্বামীর সহিত যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন, দম্পতি এক সঙ্গে দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতেছেন এবং একত্র স্বর্গভোগের কামনা করিতেছেন। সুশিক্ষিতা মহিলাগণের চিত্রও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, পুরুষ ঋষিগণের ন্যায়, তাঁহারা বেদ-মন্ত্র রচনা করিয়াছেন ও তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন; এমন কি রাজনীতি ও দেশ-শাসন কার্য্যেও তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ছিল। বড় বড় সভায় তাঁহারা উপস্থিত হইতেন এবং প্রকাশ্য ভাবে সাধারণ রাজপথে ভ্রমণ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে নারীগণ পুরুষদিগের সঙ্গে যতটা মিশিয়া থাকেন সেকালে হিন্দু রমণীগণ সে ভাবে মিশিতেন না সত্য, কিন্তু কঠোর অবরোধ প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল না। নারীগণ সেকালে কি উচ্চ সম্মান লাভ করিতেন বৈদিক সাহিত্যে তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; কিন্তু এখানে একটী সর্ব্বজন-বিদিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে; সেটী বেদের ব্রাহ্মণাংশে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে যাইতেছেন, তিনি তাঁহার ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ী ও তাঁহার সপত্নীকে স্বীয় বিষয় ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। মৈত্রেয়ী বিষয় গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া তাহার বিনিময়ে অমৃতত্ব লাভ করিবার পন্থা জানিতে চাহিলেন। লিখিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে অমৃতত্ব-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছি এই দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইতেছে। মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসা হইতে জানা যাইতেছে যে, সেকালে রমণীগণ এই প্রকার বিষয়ে প্রার্থী হইতেন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইত না।

বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল, নারীগণের উপযুক্ত বয়সে বিবাহের অনেক উল্লেখ রহিয়াছে। প্রত্যেক নারীকেই বিবাহ করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না। চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া পিতৃগৃহে বাস করিয়াছেন এবং পিতার সম্পত্তির অংশভাগিনী হইয়াছেন এরূপ নারীরও অভাব ছিল না।

নারীদিগের স্বামী নির্ব্বাচনের অধিকার ছিল। বিবাহের প্রস্তাব তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারাই উত্থাপন করা হইত, কিন্তু পাত্রীর সম্মতি পূর্ব্বেই গ্রহণ করা হইত, এরূপ বোধ হয়। বৈদিক সময়ের অল্প পরেই স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিবাহ বন্ধন ও বিবাহ অনুষ্ঠান কিরূপ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত বেদের উষা ও সোমের বিবাহের মনোরম বর্ণনা হইতে তাহা উপলব্ধি হয়। দেবতাদিগের এই বিবাহ নরনারীর বিবাহের আদর্শরূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হইলে বিধবা স্ত্রীকে একটী ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত, সুতরাং বিধবা বিবাহে শাস্ত্রের পরিষ্কার অনুমোদন ছিল।

বৈদিক সময়ে নারীর অবস্থা এইরূপ ছিল। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই সময়েও তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর সম্মান লাভ করিতেন। সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয়ে গার্হস্থ্য জীবন ও রীতি নীতির যে জীবন্ত বর্ণনা আছে, গ্রীক বা রোমীয় সাহিত্যে তদনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে পত্নীর একটী অতি সুন্দর সংজ্ঞা আছে;—"স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী ও নিকটতম বন্ধু। প্রেমিকা পত্নী ধর্ম্ম অর্থ ও আনন্দের অবিরাম উৎস; পতিব্রতা পত্নী স্বর্গলাভ সাধনায় পতির শ্রেষ্ঠ সহায়; মধুরভাষিনী স্ত্রী নির্জ্জনে স্বামীর সঙ্গিনী, পরামর্শে পিতা, বিপদে মাতা, জীবনের দুর্গম পথে বিশ্রামের স্থান।"

এখন শুনিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলে গৃহ-সুখ বিনষ্ট হইবে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালে নারীদিগকে প্রচুর স্বাধীনতা দিলেও দাম্পত্য সুখের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। স্মরণাতীত

কাল হইতে হিন্দুনারী পতিভক্তি, অপত্যস্নেহ, গৃহকর্ম্মে নিপুণতা, শ্রীলতা, অতিথি সৎকার প্রভৃতি গার্হস্থ্য সৎগুণের জন্য প্রশংসা লাভ করিয়া আসিতেছেন। পতিব্রতা রমণীর যে সকল চিত্র প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় সে গুলি কি সুন্দর! কি হৃদয়স্পর্শী! এই সকল বিবরণ হইতে আমরা প্রাচীন হিন্দুগৃহের রীতি নীতি অনেক পরিমাণে জানিতে পারি। পাশ্চাত্য দেশে নারীগণ যে স্বাধীনতা ভোগ করেন এদেশে সেরূপ স্বাধীনতা-ছিল না সত্য, এবং পত্নীগণ স্বামীর অনুগত থাকিতেন বটে, কিন্তু অধীনতা ও স্বাধীনতা কি অপূর্ব্ব ভাবেই মিশ্রিত ছিল! স্ত্রীগণ স্বামীর অনুগতা ও স্বামীসেবা পরায়ণা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নিজ মতামত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। স্বামী স্ত্রীর প্রতি কেমন প্রেমানুরক্ত ছিলেন এবং স্ত্রীকে কত সম্মান করিতেন। কন্যাগণ পিতার অনুগতা ও আজ্ঞা-কারিণী ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তেজস্বিতা ও সাহসের পরিচয় দিতে ক্রটি করিতেন না। পরিবারে প্রেম ও শান্তি বিরাজ করিত। গার্হস্থ্য ও সামাজিক সুখের কি মনোহর প্রাণস্পর্শী চিত্রই রামায়ণ ও মহাভারতে অঙ্কিত হইয়াছে। মনস্বিনী মহিলাগণের যে সকল চিত্র এই সকল মহাকাব্যে বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সে কালে নারীজীবনে প্রচুর মর্য্যাদা ছিল। রামায়ণের নায়িকা সাধ্বী সীতার দৃষ্টান্ত স্মরণ কর, আজিও হিন্দুনারী তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও পতিভক্তির অনুসরণ করে। রাজ-প্রাসাদে বর্দ্ধিতা ও কোমলাঙ্গী তরুণী হইয়াও তিনি স্বামীর সহিত কঠোর বনবাস ক্লেশ বহন করিবার জন্য ব্যাকুল এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অবরোধে বিবিধ বিভীষিকা ও প্রলোভনের মধ্যেও পতিভক্তিতে অটল অচল। বনগমনে স্বামীর অনুমতি লাভের জন্য তাঁহার অনুনয় বিনয় কি সুন্দর! আমরা তাঁহার একটুখানি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না;—"স্বামীর সুখ দুঃখের অংশ-ভাগিনী হওয়াই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেই খানে যাইব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও থাকিতে চাই না। তুমি আমার রাজা, আমার গুরু ও আশ্রয়। তুমিই আমার দেবতা। তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কণ্টকাকীর্ণ পথে আমি পদচারণ করিব। তোমার সঙ্গে ভ্রমণ করিতে আমার কোন ক্লেশ হইবে না, পথের কণ্টক আমার নিকট তুলাজিনের ন্যায় কোমল বোধ হইবে। তোমার সঙ্গে দারুণ মরুপ্রান্তরে ভ্রমণ করিলেও সহস্র বৎসর এক দিনের ন্যায় অনুমিত হইবে। তোমার সঙ্গে নরকে বাস করিলে তাহাও আমার নিকট স্বর্গ সুখ বোধ হইবে।"

সাবিত্রীর উপাখ্যান সতীত্বের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও বনবাসী সন্ন্যাসী-তনয়কে পতিত্বে মনোনীত করিয়াছেন। সেই যুবক আবার সম্বৎসর মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবেন, এই শাপে অভিশপ্ত। অকালে নিদারুণ বৈধব্য ক্লেশ সম্মুখে দেখিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না, সংকল্প রক্ষা করিয়া সত্যবানকে বিবাহ করিলেন। অবিশ্রাম যত্ন সহকারে স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন, তথাপি কঠোর অভিসম্পাত ব্যর্থ হইল না। কিন্তু তাঁহার অনুরাগ, সাহস ও করুণ অনুনয়ে মৃত্যু-রাজ যমেরও অনুকম্পা হইল, অপূর্ব্ব পতিপ্রেমের বলে সাবিত্রী মৃত পতি ফিরিয়া পাইলেন।

এই প্রকার কত সুন্দর বিবরণে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য পূর্ণ। এই সকলের সৌন্দর্য্যে আমাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

রাখি-বন্ধন।

স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে একটী সুন্দর অনুষ্ঠানের আমদানি করিয়াছে। রাখি-বন্ধন এত দিন রাজপুত ও হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল; ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির অনুকূল বলিয়া জাতীয় দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী এই অনুষ্ঠানটীকে এবার জাতীয় ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

যুগযুগান্তর হইতে রাজপুতানায় রাখি-বন্ধন প্রচলিত, অনেক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী ইহার সঙ্গে

জড়িত। জনশ্রুতি এই যে, দুর্ব্বাসা মুনি শ্রাবণ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রবণাকে দুর্ভাগ্যের আক্রমণ নিবারণের জন্য 'রাখি-বলয়' পরিতে উপদেশ দেন। এই জন্য শ্রাবণের সংক্রান্তি দিনে রাজপুতানায় রাখি-বন্ধন পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। শুধু মহিলাগণ এবং ব্রাহ্মণগণই রাখি-বন্ধন করিতে পারেন। কোন নারী যাঁহার হস্তে রাখি-বন্ধন করেন তিনি রাখি-বন্ধনকারিণীর ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া গণ্য হন। এই ধর্ম্মভ্রাতার নাম 'রাখি-বন্ধ্ ভাই।' রাখি-বন্ধন-জনিত এই ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ রাজপুত জাতির চক্ষে অতি পবিত্র, রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষাও ইহা মূল্যবান্। কোন প্রকার বিপদে পড়িয়া কোন পুরুষের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইলে রাজপুত রমণী রাখি প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রাতৃত্বে বরণ করিতেন। যাঁহার নিকট রাখি প্রেরিত হইত তিনি আপনাকে সম্মানিত মনে করিতেন। শত্রু মিত্র ভেদ নাই, হিন্দু মুসলমানের বিচার নাই, যখনই কাহার নিকট রাখি প্রেরিত হইয়াছে, তখনি 'রাখি-বন্ধ্ ভাই' ধর্ম্মভগিনীর কার্য্যোদ্ধারের জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

সামান্য সূত্রবলয় হইতে আরম্ভ করিয়া মণিমাণিক্য খচিত হীরক-বলয় পর্য্যন্ত রাখিরূপে প্রেরিত হইত। 'রাখি-বন্ধ্ ভাই' রাখি গ্রহণের চিহ্নরূপে উপঢৌকন সহিত একটী কাচুলী (এক প্রকার জ্যাকেট) ভগিনীর নিকট প্রেরণ করিতেন। এই কাচুলী ধর্ম্মভগিনীকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ।

প্রাচীনকালে রাজপুত মহিলাগণ মুসলমান সম্রাটগণের নিকটও রাখি প্রেরণ করিতেন। মহামনা আকবর, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজহান প্রভৃতি প্রতাপান্বিত সম্রাটগণ রাজপুত মহিলার 'রাখিবন্ধ্ ভাই' ছিলেন। মুসলমান সম্রাটগণ এই ভ্রাতৃসম্বন্ধকে কিরূপ পবিত্র চক্ষে দেখিতেন ও এই সম্বন্ধের জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিতেন, আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুনের জীবনের একটী ঘটনা পাঠ করিলে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারা যায়।

মহারাণা রত্নের মৃত্যুর পর তাঁহার অযোগ্য ভ্রাতা, রাণা সংঙ্গের (সংগ্রাম সিংহ) চতুর্থ পুত্র বিক্রমজিৎ চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। এই অদূরদর্শী রাণার নির্ব্বোধ ব্যবহারে মিবারের সামন্তগণ উত্যক্ত, রাজ্য অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গুজরাটের অধিপতি সুলতান বাহাদুর চিতোরের পূর্ব্ব রাণা রায় মল্ল কৃত কোন এক অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উৎকৃষ্ট সুযোগ বুঝিতে পারিয়া মিবার আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই দুঃসময়ে সামন্ত রাজগণ কেহই বিক্রমজিতের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না; তাঁহারা তাঁহার দুর্ব্যবহারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। বিক্রমজিৎ যুদ্ধে বাহাদুর কর্তৃক পরাজিত হইলেন। বিজয় গৌরবে বাহাদুর চিতোর দুর্গ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিক্রমজিৎকে পরিত্যাগ করিলেও রাজপুত পুণ্যভূমি মিবারের কল্যাণের প্রতি উদাসীন হইতে পারে না, রাজপুত-গৌরবের কীর্ত্তিস্তম্ভ চিতোর দুর্গকে শত্রু হস্তে বিধ্বস্ত হইতে দেখিতে পারে না। চিতোরের আসন্ন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া দলে দলে সসৈন্য সামন্তগণ চিতোর রক্ষায় ধাবিত হইলেন। যাঁহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন তাঁহারাও চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তর্পণের জন্য ধমনীর শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাহাদুরের অগ্নিবর্ষী কামানের সম্মুখে রাজপুতের অমানুষিক শৌর্য্য ব্যর্থ হইল, রাজপুতকুল নির্ম্মূল হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান বীরগণ সকলেই একে একে ধরাশায়ী হইলেন। তখন বীরবর সঙ্গের বীর্য্যবতী মহিষী জোহর বাই রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন, আপাদ মস্তক বর্ম্মে আবৃত করিয়া রণচণ্ডী বেশে শত্রু দলনে অগ্রসর হইলেন। রাজপুত রমণীর ধমনীতে রক্ত-বিন্দু থাকিতে চিতোর বিধ্বস্ত হইবে? তাঁহার সপত্নী-পুত্র, রাণা সঙ্গের বংশধর শিশু উদয়সিংহ শত্রু হস্তে পতিত হইবে? জোহর বাইয়ের প্রাণে ইহা সহিল না। শত্রু সাগরে ঝম্প প্রদান করতঃ অসংখ্য মুসলমান সেনা বিনাশ করিয়া প্রকৃত বীরনারীর ন্যায় জোহর বাই প্রাণত্যাগ

করিলেন। কিন্তু তথাপি চিতোরের আসন্ন বিপদের নিবৃত্তি হইল না, মুসলমান সৈন্য পরাজিত হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজপুত নারীগণ তখন নিদারুণ জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে. ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুত রমণী সেই দুর্দ্দিনে অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করিলেন। দেশের দুর্দশা দেখিয়া ভারত-রমণী এক সময়ে মরিতে জানিত।

শিশু উদয়সিংহের জননী রাণী কর্ণবতী জহর-যাত্রিনী দিগের অগ্রগামিনী ছিলেন, কিন্তু শিশু পুত্রের ভবিষ্যৎ বিপদে তিনি তাহার রক্ষার উপায় করিয়া যাইতে ভুলেন নাই। প্রাতঃস্মরণীয় আকবরের পিতা হুমায়ুন তখন বঙ্গদেশ বিজয়ে ব্যস্ত। কর্ণবতী তাঁহার নিকট 'রাখি-বলয়' প্রেরণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুরমণীর রাখি প্রাপ্ত হইয়া মুসলমান হুমায়ুন বঙ্গবিজয়ে বিরত হইলেন, স্বধর্ম্মী বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। হুমায়ুনের হস্তে পরাজিত হইয়া বাহাদুর চিতোর ত্যাগ করিলেন। 'রাখি' চিতোরকে রক্ষা করিল। এই রাখি-বন্ধন এক সময়ে এতই পবিত্র অনুষ্ঠান ছিল।

যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে এত পবিত্রতা, এত স্মৃতি জড়িত, জন্মভূমির দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী তাহাই এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দিনে ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির জন্য এবার ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের নরনারী পরস্পরের হাতে রাখি বাঁধিয়াছেন, দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের বিভিন্ন জাতি সমূহকে এক জাতিতে পরিণত করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। "এক দেশ এক ভগবান্, এক জাতি এক মন প্রাণ",—এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। ভগবান বঙ্গবাসীর প্রার্থনা পূর্ণ করুন। বর্ষে বর্ষে বঙ্গদেশে রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠিত হউক। হিংসা বিদ্বেষ, আত্মবিচ্ছেদ এদেশ হইতে দূর হউক। প্রাচীন স্মৃতি, প্রাচীন পবিত্রতা, প্রাচীন গুরুত্ব লইয়া 'রাখি' এদেশে আগমন করুক, স্থায়ী হউক। আমরা অধম বাঙ্গালী এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে যেন লঘু করিয়া না ফেলি। কবির অনুপ্রাণিত হৃদয়ের পবিত্র অনুপ্রাণনা লইয়া জন্মভূমির কল্যাণের জন্য প্রতি বৎসরই যেন ভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে আমরা প্রার্থনা করিতে পারি :—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক হে ভগবান॥
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান॥
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান॥"

আদর্শ দাম্পত্য জীবন।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—নব-জীবন।

ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনে যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের গ্রামের সেই বন্ধুদের সঙ্গে আমার প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। * * *

ফণীদের বাড়ী আমাদের মিলনের স্থান ছিল। এক দিন সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মবন্ধুরা সঙ্কীর্ত্তন করিলেন; আমিও একপার্শ্বে বসিয়া ছিলাম। তাঁদের এক খানি ঘর তখন নূতন হইতেছিল, সব জায়গার মাটী তখনও সমান করা হয় নাই, সেই ঘরেই সঙ্কীর্ত্তন হইল। প্রথমে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, পরে ক্রমে ক্রমে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। গান হইতেছে—"তুমি পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি,

---

* মূল পুস্তকের এখন পর্য্যন্ত নামকরণ হয় নাই। 'আদর্শ দাম্পত্য জীবন' আমাদের প্রদত্ত নাম। ভাঃ মঃ সঃ।

বামন জনায় চাঁদ ধরাও নাথ।" একটু পরেই প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হইল। অন্ধকারে তাঁহাদের সেই প্রমত্ত কীর্ত্তন আমি কখনই ভুলিব না। তাঁহাদের সেই প্রমত্ত অবস্থা দেখিয়া আমি গোপনে বলিতে লাগিলাম, 'ভগবান্ ইহাদিগকে যে সুখ দিয়াছ, আমাকে কি তাহা দিবে না?' এ কথা যতই বলি ততই আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এমন মিষ্ট ক্রন্দন আর কখন কাঁদি নাই।

এইরূপে আমি ক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। এক দিকে তোমার আকর্ষণ, অপর দিকে ব্রাহ্মবন্ধুদের আকর্ষণ, দুইই বাড়িতে লাগিল। কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিলাম। ১৮৬৮ সালের মাঘোৎসব এক স্মরণীয় ব্যাপার। সেই বার প্রথম নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। "তোরা আয়রে ভাই এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম" এই গান হইয়াছিল। আমার মন এই গানে মাতিয়া গেল। সেই সময় হইতে নিয়মিত রূপে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যাইতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধু ফণী এই সময়ে আমার অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন।

১৮৬৮ সালের শেষভাগে ছুটীতে দেশে গেলাম। এই সময়ে এক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ সালের কলিকাতার মাঘোৎসবে আমি যাইব এই স্থির ছিল। সেই সময়ে তুমি এক দিন বিষাক্ত কুল খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলে। দুই তিন জন ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসা করা হইল। বিষ উঠিল না, কিন্তু ঔষধের গুণে নষ্ট হইল। তাহার পর তোমার জ্বর হইল। সেই দিন আমার কলিকাতা যাইবার কথা। মনটা বড়ই ব্যাকুল হইল। কলিকাতা যাই, কি এরূপ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত স্ত্রীর শুশ্রূষা করি! সকলে আহার করিয়া শয়ন করিল। তোমাকে যত্নে শয্যায় শায়িত করিয়া দিলাম। মশারি ফেলিয়া চারিদিক ঠিক করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম। মাতা কত নিষেধ করিলেন, তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। উত্তরে বলিলাম, "নদীতে জোয়ার আসিয়াছে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না।" কলিকাতার উৎসব যায়, আমি কি থাকিতে পারি? তোমাকে ফেলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু নৌকায় আসিয়া অন্ধকারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা হইল। সেবার কলিকাতার উৎসব অতীব আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। সেবার নাকি বিধাতার জন্য প্রথম ত্যাগ স্বীকার করিলাম, তাই প্রভুর করুণা বেশী মাত্রায় ভোগ করিলাম।

যখন নূতন সেজবধূর সহিত তুমি কলিকাতায় আসিলে, তখন হইতে আমার ধর্ম্ম তোমাকেও দিতে যত্ন করিতে লাগিলাম। প্রতিদিন প্রভাতে একটী করিয়া গান করিতাম ও একটু প্রার্থনা করিতাম। "গাও তাঁরে গাও তরুণ ভানু" এই গানটী প্রায় রোজ গান করিতাম। তুমি উঠিয়া বসিতে, তারপর প্রার্থনা হইত। এই সময় এক দিন আমার মাতা তোমাকে ষষ্ঠী করিতে বলেন। ষষ্ঠীতে ভাত খাইতে হয় না, আমার ইহা কুসংস্কার মনে হইল। আমি বলিলাম তোমাকে ভাত খাইতে হইবে। শাশুড়ীর কথা রক্ষা করি, কি স্বামীর কথা রক্ষা করি, এই উভয় সঙ্কটে পড়িলে। আমি কিন্তু তখন একথা জানিতে পারি নাই। পরে শুনিলাম যে তুমি দুই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে। বৈকালে অন্ন গ্রহণ করিয়া রাত্রে পুরী খাইয়াছিলে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম তখন তুমি বলিলে ভাত খাইয়াছি। মাতার কাছে কি বলিয়াছিলে, জানি না। বালিকা বলিয়া তখন বুঝিতে পার নাই যে দুই দিক রক্ষা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইহার কিছুদিন পরে মাণিকতলা হইতে মির্জাপুরে বাসা পরিবর্ত্তন হয়। মেয়েদের লইয়া আসিবার ভার আমার উপরে পড়িল। এরূপ ভার কিছু নূতন নয়। সকলেই আমাকে ভালবাসিতেন আর এরূপ ভার প্রায় আমাকেই দেওয়া হইত। এরূপ সেবায় আমি কখনও পরাঙ্মুখ হইতাম না। পদব্রজে আমি আগে আগে, মাতা ও অন্যান্য বধূরা পশ্চাতে যাইতেছিলেন। একবার ফিরিয়া দেখি যে তোমরা সকলে কাপড়ে কাপড়ে সংযুক্ত করিয়াছ। যেন এক গাছা মানুষের শিকল চলিতেছিল। দেখিয়া বড় হাসি পাইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পথ ভুলিয়া যাইবার ভয়ে এইরূপ করিয়াছ। বাল্যকালে এই

অবস্থা, আর শেষ জীবনে একাকী কত সময় রেলপথে চলিয়া গিয়াছ; যেখানে নির্ভীকতার প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি কখনও পশ্চাৎপদ হও নাই।

কিছুকাল পরে তোমার সন্তান হইবে বলিয়া তুমি পিত্রালয়ে গেলে। সেখানে গিয়া তোমার জর হইল। ৮ মাসের সময় অত্যন্ত অধিক জর হইল ও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে কলিকাতার বাসায় নূতন সেজ বধূ মারা গেলেন। তোমারও অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইল। তোমার জীবনের আশঙ্কা হইল। অবশেষে তোমার মেসো মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তোমার প্রাণরক্ষা করাই প্রয়োজন বলিয়া গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমুদয় আয়োজন ঠিক হইল। কোন্ ঘরে ঐ কায হইবে, কোন্ কোন্ ঔষধের আবশ্যকতা সমুদয় ঠিক হইল। এত বড় কায একাকী করা ভাল নয়, এই বলিয়া টাকী হইতে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বড় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয়কে আনিতে পাঠান হইল। টাকী যাইতে হইলে নদী পার হইতে হয়। নদীতে তুফান উঠিল, সেই জন্য সে রাত্রে ডাক্তার আনিতে পারিলেন না। অতি প্রত্যূষে বড় ডাক্তার আসিবেন, ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া গর্ভস্থ শিশু বধ হইবে, এ বিষয়ের সকল আয়োজন ঠিক রহিল। মানুষেরা সন্তান বধ করিবার সমুদয় উপকরণ ঠিক করিলেন, কিন্তু ভগবান তো মানুষের মতে চলেন না। রাত্রেই বেদনা উপস্থিত হইল। প্রসূতি তুমি ডাক্তারদের সমুদয় ষড়যন্ত্র শুনিতে পাইয়াছিলে। কাহাকেও না বলিয়া রাত্রি দুইটার সময় একাকী দৌড়িয়া নীচের ঘরে আসিলে। অক্লেশে তোমার প্রথম সন্তান সুসারবাসিনী জন্মগ্রহণ করিলেন। যে ঘর তাঁহার মৃত্যু-গৃহ স্থির হইয়াছিল সেই ঘরে তাঁহার জন্ম হইল। গোবিন্দ ডাক্তার প্রাতঃকালে আসিয়া দেখেন বাটীতে ধুম নির্গত হইতেছে। সকলেই আনন্দিত হইলেন। আমি সংবাদ পাইয়া ভগবানকে কতই যে ধন্যবাদ দিলাম তাহার আর ঠিক নাই। এইরূপে জানিতে পারিলাম যে তিনি যাহা বিধান করেন তাহার আর অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ সকল কথা তোমারই মুখে শুনা, আবার তোমাকেই বলিতেছি। এই ঘটনায় তোমার ইচ্ছা শক্তির প্রথম জন্ম হয়। তোমার মনে যদি প্রবল বেগ না আসিত, শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য এমন ব্যাকুলতা না আসিত, তাহা হইলে সে রাত্রে কন্যা সুসার কেমনে রক্ষা পাইতেন, বল? এই ইচ্ছা শক্তির বলেই পরবর্ত্তী জীবনে তুমি সংযম শিখিতে পারিয়াছিলে; শরীরের সমুদয় আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলে।

১৮৭০ সালের শীতের ছুটীতে দেশে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা পড়িতে ভাল লাগিত। একদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, নিদ্রার পূর্ব্বে উক্ত পুস্তক একমনে পাঠ করিতেছিলাম। ভীষণ শ্মশানের কথা পাঠ করিতেছি, এমন সময় তুমি শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলে, ও আমাকে নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে দেখিয়া বিদ্রূপচ্ছলে কি বলিতে লাগিলে। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইল। ভালভাবে বলিলাম যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কৌতুক করিলে অত্যন্ত ব্যথা পাই। সেই যে তুমি নিবৃত্ত হইলে আর তুমি কখনও আমার বিরোধী হও নাই। ইহার পর হইতে আমি তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্য যাহা কিছু চেষ্টা করিতাম, তুমি সে সকলের পক্ষপাতিনী হইতে। বাল্যকাল হইতে গ্রামে প্রতিপালিতা বলিয়া গ্রামের লোকদের মত তুমিও ছোট ছোট বিষয়ে সত্যের অপলাপ করিতে। আমার তাহাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইত। আমার কথাতে তুমি তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিলে। ক্রমে তুমি আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস সকল গ্রহণ করিতে লাগিলে, আমার মনে আর আনন্দ ধরিত না। এই সময়েও রাত্রিতে গোপনে শয্যাতে বসিয়া তোমাকে পড়াইতাম ও তোমাকে লইয়া প্রার্থনা করিতাম। কখনও তুমি ব্রাহ্মসমাজের মুখ দেখ নাই। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদি অতি অল্পই পাঠ করিয়াছিলে। পাঠ করিবার ক্ষমতাও তত ছিল না।

আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় পড়িতে হইল। ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস উপস্থিত হইল। সে সময়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসন্তের বিবাহের

উদ্যোগ হইতেছে। বিবাহাদির সময় আমাদের দেশে জলসওয়া বলিয়া একটা অনুষ্ঠান করা হয়। পাঁচ বাড়ী হইতে জল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই জলে কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্ব দিন স্নান করান হয়। আমাদের দেশে জল ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকর বাদ্য বাজায় এবং কুলনারীরা কুৎসিত সঙ্গীত করিতে থাকে। এ প্রথা আমার অত্যন্ত দোষাবহ মনে হইত। আমি তোমাকে বলিয়া দিলাম, তুমি একার্য্যে যোগ দিও না। আমার কথা রাখিতে গিয়া তুমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলে। এ বিষয়ে কন্যা বসন্ত নিজেই লিখিয়াছেন :—"আমার বিবাহ ১২৭৭ সালে ১৬ই ফাল্গুন সোমবার হয়। আমার বয়স তখন ১১ বৎসর। জলসওয়ার জন্য কাকিমাকে অত্যন্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রে জলসওয়া এবং বিকালে বড়ি দেওয়া ও ক্ষীর করা হয়। ঐ দিন ঠাকুর মা কহিলেন, 'বসন্তের মা নাই, এবং এখানে অন্য খুড়ী জেঠাই নাই; শাস্ত্রের সমুদয় তোমাকেই করিতে হইবে। যদি না কর, তাহা হইলে বাড়ী হইতে দূর হও। যদি কন্যার কোন অমঙ্গল হয়, জানিতে পারিবে।' এই সময় সেজ জেঠাইমাও আসিলেন ও বলিলেন, 'ছিঃ, তোমার লজ্জা হয় না? আঘাটায় যাইয়া গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মর' ইত্যাদি। এত নির্য্যাতনেও কাকিমার বিশ্বাস অটল রহিল। সেদিন কাঁদিয়া অনাহারে কাটাইয়াছিলেন। কাকিমা কেন এরূপ সকলের অবাধ্য হইয়াছিলেন, তখন কিছুই বুঝিতাম না। রাত্রে যখন জলসওয়ার সময় হইল, প্রথমে সকলেই তাঁহাকে ডাকিল। তিনি যাইতে অস্বীকার করিলে সকলে বলপূর্ব্বক টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। আমি মাঝের দালানে বসিয়াছিলাম। যখন তাঁহাকে টানাটানি করা হয় দেখিয়াছিলাম।" তোমাকে তো এইরূপে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হইল; আমি আমার মনের ক্ষোভে রহিলাম। রাত্রিতে যখন তোমাকে লইয়া সকলে ঘরে ফিরিলেন, আমি আর তোমাকে ঘরে আসিতে দিই নাই। তোমার দোষ ছিল না; আমি আর সকলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে না পারিয়া তোমাকেই আরও একটু কষ্ট দিলাম। যাহা হউক, এই ঘটনার পর হইতে তোমাকে ও আমাকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকবার দাঁড়াইতে হইয়াছিল। তুমি আমার অনুগত হইয়া প্রত্যেক বারই বিশ্বাস রক্ষা করিতে যত্ন করিয়াছ। এইরূপ সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার সময় ইহার পর হইতে আমি তোমার নিকটে আশ্চর্য্য সাহায্য পাইয়াছি। তুমি পূর্ব্বে কিছুই শিক্ষা পাও নাই, কিন্তু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সময় তোমার যে দৃঢ়তা দেখিতে লাগিলাম, তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। পরবর্ত্তী জীবনে এই সাহসের এমন বিকাশ হইয়াছিল যে, দেখিয়া অন্যেরাও চমৎকৃত হইত। * * * * (ক্রমশঃ)

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার উষা-কীর্ত্তন।

জাগরে ভাই, জাগ ভগিনীগণ,
(দেখ) আশীষ আলোকে পূর্ণ গগণ।

কেটেছে জড়তা-জড়িত যামিনী,
দীপ্ত তীক্ষ্ণ-ত্বরিত দামিনী,
অতি আলোকিত, অতি পুলকিত
(দেখ) নব জীবনে জলে প্রাণ মন।

ফেলি গেহ কোণে যত দলাদলি,
মেলি স্নেহ আঁখি, এস গলাগলি,
উথলিত প্রেমে, উছলিত ক্ষেমে,
(আজি) ধন্য কর শুভ ক্ষণ।

দুয়ারে দাঁড়ায়ে নতশিরে ভাই,
আশীষ-তিলক ভগিনী গো চাই,
জননীর পদে বিপদে সম্পদে,
(সাধ) করিতে সবই সমর্পণ।

যে দিল জাগায়ে চাহি তাঁর পানে
চূর্ণ আলসে; সাহসে, সম্মানে
নব তেজে সাজি, নব কাজে আজি
(সবে) জীবন কর নিমগন।

শ্রীপ্রেমতোষ বসু।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বদেশী আন্দোলন—দুই বৎসর পূর্ব্বে, আহ্মদাবাদে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পর একখানি ইংরেজ পরিচালিত সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছিল—"বাঙ্গালী বক্তৃতা করে, মান্দ্রাজী শোনে, আর বোম্বাইবাসী কাজ করে।" এত দিন ইহাই সর্ব্বসাধারণের ধারণা ছিল। আমাদের ভিতরে যে প্রচুর কর্ম্মশক্তি লুক্কায়িত আছে, আমরা আপনারাই তাহা জানিতাম না। বিধাতার কৃপায় এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের নিদ্রিত আত্মশক্তি জাগ্রত হইয়াছে, সকলে বুঝিয়াছে, বাঙ্গালী কেবল বাক্‌সর্ব্বস্ব নহে; আমরা নিজেরাও বুঝিয়াছি যে, আমরা ইচ্ছা করিলেই অনেক কাজ করিতে পারি। বঙ্গনারীর মোহ নিদ্রাও যেন একটু ভাঙ্গিয়াছে। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে নারীগণ মিলিত হইয়া যেরূপ স্বদেশানুরাগ দেখাইতেছেন, এদেশে পূর্ব্বে কেহ কখনও সেরূপ দেখে নাই। এই আন্দোলন বাঙ্গালী জাতিকে যেন উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। স্বদেশ-প্রীতি মৌনকে বক্তা, অলসকে কর্ম্মী ও কৃপণকে দাতা করিয়াছে, এবং জাতীয় চরিত্রের জড়তা অনেকটা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলকেই এই আন্দোলন স্পর্শ করিয়াছে। এখন আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যে, আমাদের আরব্ধ চেষ্টা যেন শিথিল হইয়া না পড়ে। পরাধীনতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া দিয়াছে, কোন বিষয় দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অতি কঠিন। ভগ্নীগণের নিকট নিবেদন এই, সকলে কর্ত্তব্যে, সংকল্পে দৃঢ় থাকুন, বঙ্গনারীর স্কন্ধে বিধাতা এবার অতি গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

জাতীয় মিলন-মন্দির—কোটী কোটী বাঙ্গালীর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন। গত ১৬ই অক্টোবর দেশের এই মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। ঐ দিন যে প্রবল উদ্দীপনা দেখা গিয়াছে, এদেশে তাহা সম্পূর্ণই নূতন। লক্ষ লক্ষ লোক সম্মিলিত হইয়া সে দিন কলিকাতায় এক মহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দেশকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালী এই অঙ্গচ্ছেদের কুফল ব্যর্থ করিবার জন্য, বাঙ্গালীর জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে "জাতীয় মিলন-মন্দির" (Federation Hall) নামে এক সুবৃহৎ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ২৯৪নং আপার সার্কুলার রোডে এই মন্দির নির্ম্মিত হইবে। মাননীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পূর্ব্ববঙ্গের সুসন্তান ও সমস্ত ভারতের গৌরবস্থল শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল কঠিন রোগে শয্যাশায়ী থাকিলেও দেশের দুর্দ্দিনে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি চলৎশক্তি রহিত, চেয়ারে বসাইয়া তাঁহাকে সভায় বহিয়া আনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বসু মহাশয়ের লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। আমরা বক্তৃতার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আজ আমাদের এই দেশ দ্বিখণ্ডিত, আজ আমাদের ঘোর দুর্দ্দিন। আমাদের চতুর্দ্দিকে আজ বহু বিপদের সম্ভাবনা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে অনেক সময় অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমাদের মস্তকের উপর যে মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা স্বর্ণময় কিরণে সুরঞ্জিত; অভিনব এবং দৃঢ়তর জাতীয় মিলনের বন্ধন আজ আমরা অনুভব করিতেছি, ইহাতেই এই দিন আমাদের নিকট আনন্দের দিন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কবির উক্তি 'মরা গাঙে বান্ এসেছে,' একটুও মিথ্যা নহে। আমরা হৃদয়ে জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছি, জাতীয় আহ্বানধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির এই শুভ মিলন-ক্ষণে আমাদের হৃদয় আনন্দভরে সেই বিশ্বপতির সিংহাসন-প্রান্তে অবনত হউক। যে মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করে—

সেই মেঘ হইতেই বৃষ্টিধারা ঝরিয়া জীবন দান করে। লাঙ্গলের ফালে ধরাতল বিদীর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহার ফলেই সুবর্ণময় শস্যরাশি লাভ হয়। দুরন্ত শীতের অবসানে সুখময় বসন্তের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্ব বঙ্গ আজ বিচ্ছিন্ন—আমি পূর্ব্ব বঙ্গের লোক, কিন্তু আজ আমি আমার ভ্রাতৃগণের সহিত যে আত্মীয়তা বন্ধন অনুভব করিতেছি, আপনারা আজ আমাদের জন্য যে প্রীতি অনুভব করিতেছেন, এমন আর কখন অনুভূত হয় নাই। সরকারী ভেদনীতি আমাদের পরস্পরকে অধিক আপনার করিয়া দিয়াছে। আমাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্ব বিভাগের অধিবাসী বঙ্গদেশেরই অধিবাসী, এ বঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। বাঙ্গলা আমাদের চিরদিনের কল্যাণময়ী জননী। ধর্ম্ম ও বিশ্বাসে আমরা বিভিন্ন হইতে পারি, কিন্তু আমাদের মাতৃভুমি আমাদের সকলেরই জননী। সেই জন্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা সকলেই ভাই ভাই, এই জন্যই আমাদের হৃদয় পরস্পরের অধিকতর নিকট হইয়াছে। আজ আমরা এই মিলন-হর্ম্ম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছি—এই ভিত্তি যে কেবল এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা নয়, আমাদের বাষ্পরুদ্ধ হৃদয়ে ইহার প্রতিষ্ঠা। যুগযুগ ধরিয়া ভবিষ্য বংশীয়গণের নিকট ইহা মিলনের চিহ্নরূপে প্রতিভাত হইবে। যে অমঙ্গলনীতি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে—যে দুর্দ্দিনে এই দুর্ঘটনা ঘটিল—এই মন্দির চিরদিন আমাদের মানসক্ষেত্রে তাহা জাগরূক রাখিবে। আমার বিশ্বাস ইহা আমাদের জাতীয় মিলন-ক্ষেত্র হইবে। ইহার কক্ষে কক্ষে আমাদের সামাজিক মিলন ও আরও কত কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সূচনা হইবে। কেবল জাতীয় মিলন নহে, জাতীয় উন্নতিরও ইহা সাধনার মন্দির হইবে।"

বক্তৃতার পর জনসাধারণের সংকল্প জ্ঞাপক নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র সভা স্থলে পঠিত হইয়াছিল।

"যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশ বিভাগ করাই ঠিক করিলেন, অতএব আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং আমাদের জাতীয় একতা সংরক্ষণকল্পে আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি, আমাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিব।"

আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রহ—কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ পৃথিবী হইতে কত দিনে বিলুপ্ত হইবে জানি না। পরাক্রান্ত শ্বেতাঙ্গ জাতি সকল চির দিনই কৃষ্ণাঙ্গদিগের উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে। আমাদের শ্বেতকায় আর্য্য পিতৃগণ ভারতের আদিম কৃষ্ণকায় অধিবাসীগণকে কতই না নির্য্যাতন করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা কিয়ৎ পরিমাণে সেই পাপেরই ফল কি না কে বলিতে পারে? আধুনিক সভ্যতার গৌরবে স্ফীত হইয়া পাশ্চাত্য দেশীয়গণ কৃষ্ণাঙ্গদিগকে কত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে, আমরা সকলেই তাহা বিশেষ রূপে অবগত আছি। সম্প্রতি আমেরিকাবাসীগণ কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষের যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান সভাপতি রুজ্‌বেল্ট অতি মহাপ্রাণ লোক। তিনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গগণকে একই ঈশ্বরের সন্তান মনে করিয়া কৃষ্ণকায় নিগ্রোদিগের সঙ্গে আহার বিহার করেন, এজন্য বহুলোক তাঁহার প্রবল বিরোধী। কিছুদিন হইল আমেরিকার মিসিসিপি প্রদেশে একজন নিগ্রোকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া এক শ্বেতকায় রমণী রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই অঞ্চলে শ্বেতকৃষ্ণের বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিচারে রমণীর দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। আইনে ইহা অপেক্ষা গুরুতর দণ্ডের বিধান নাই বলিয়া বিচারক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ন্যায়পরতার আদর্শ যে দেশে এত দূর হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে সে দেশের ভবিষ্যৎ বড় নিরাপদ নহে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

... L LIB ... 190

৭৭

BENG… 6 APR 190… WRITERS BUILDINGS

ভারত-মহিলা

Ic2/3 498

Ic2 15-8 2nd-1906

> The woman's cause is man's; they rise or sink
> Together, dwarfed or God-like, bond or free;
> If she be small, slight-natured, miserable,
> How shall men grow?
>
> *Tennyson.*

১ম ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১২। | ৪র্থ সংখ্যা।

কুমারী ম্যানিং।

যে সকল পুণ্যশ্লোক ইংরেজমহিলা তাঁহাদের পুণ্যকর্ম্ম ও পবিত্র জীবনের সৌরভে স্বদেশ আমোদিত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের উজ্জ্বল কীর্ত্তি সমগ্র মানব সমাজকে আলোকস্তম্ভের ন্যায় কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শন করিতেছে, কুমারী এলিজাবেথ্ এডেলেড্ ম্যানিং তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত। কুমারী নাইটিনগেইল্, কুমারী কার্পেণ্টার, কুমারী কব্, ভগ্নী ডোরা প্রভৃতির একসঙ্গে তাঁহার নাম করাতে হয়ত কুমারী ম্যানিং বিশেষ আপত্তি করিতেন। তিনি অতীব বিনয়ী ও আত্মগোপনেচ্ছু ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহার প্রসিদ্ধি বা প্রশংসা হয়, ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত অনিচ্ছা ছিল। তিনি কার্য্যের মাহাত্ম্যই দেখিতেন, যাহাদ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইল তাহার নামোল্লেখ বা যশোকীর্ত্তন সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক বোধ করিতেন। বিশেষতঃ নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না, সকল কার্য্যই শঙ্কা ও সঙ্কোচ সহকারে করিতেন। কিন্তু তাঁহার নাম যে উল্লিখিত নারীরত্ন সমূহের মধ্যে গণনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে তাঁহার জীবন বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য। ফলতঃ তাঁহার জীবনের অধিকাংশই ভারতের সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার চরিত-চিন্তনে ভারতমহিলা যে বিশেষ আনন্দ ও উপকার লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

কুমারী ম্যানিঙের পিতা জেমস্ ম্যানিং একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত "ম্যানিং ও গ্রেঞ্জার" নামক "ল-রিপোর্ট" সমূহ বিধি-ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ আদরণীয়। তিনি কাউন্টিকোর্টের বিচারক ও স্বর্গীয়া মহারাণী বিক্টোরিয়ার "য়্যান্‌শিয়েণ্ট্ সারজেণ্ট্" পদাভিষিক্ত ছিলেন। ১৮৬৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে উক্ত পদ উঠিয়া যায়। কুমারী ম্যানিং যৌবনকালেই কুমারী কার্পেণ্টারের কার্য্যক্ষেত্রের সহকারিণী হন। পতিতা রমণীর উদ্ধার ও শিক্ষা, পরিত্যক্ত বালক বালিকার তত্ত্বাবধান, শ্রমজীবী-শ্রেণীর উন্নতি, কারাবাসী-

দিগের সংশোধন প্রভৃতি বহুল পুণ্য-কার্য্যের সহিত কুমারী কার্পেণ্টারের নাম সংযুক্ত। কুমারী ম্যানিং তাঁহার পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক লোকহিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। বিশেষ ভাবে তিনি কিণ্ডারগার্টেন নামক শিক্ষাপ্রণালী প্রচারোদ্দেশে স্থাপিত "ফ্রোবেল সোসাইটি"র সম্পাদিকা ছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার ব্যতীত আর একটী মহিলার দৃষ্টান্তদ্বারা কুমারী ম্যানিং বিশেষরূপে উপকৃত হন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের দিকে তাঁহার চিত্তাকর্ষণের প্রধান কারণ সেই মহিলা। তিনি তাঁহার বিমাতা দ্বিতীয়া মিসেস্ ম্যানিং। দ্বিতীয়া মিসেস্ ম্যানিং দুইবার বিবাহিত হন। তাঁহার প্রথম স্বামী মিষ্টার স্পিয়ার ভারতবর্ষে বিষয়কর্ম্ম করিতেন। এই সূত্রে তাঁহার পত্নী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন ও এই দেশ-বিষয়ে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রথমে ১৮৫৬ সালে "লাইফ্ ইন্ য়্যান্শিয়েণ্ট্ ইণ্ডিয়া" নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ সালে ইহা পরিবর্ত্তিত আকারে "য়্যান্শিয়েণ্ট্ য়্যাণ্ড্ মেডিইব্যাল ইণ্ডিয়া" নামে পুনঃ প্রচারিত হয়। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্রী কুমারী ম্যানিঙের বিমাতা হইয়া তাঁহাকে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও ভারতরমণীর উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে বিশেষরূপে উৎসাহান্বিত করেন। ইংলণ্ডীয় স্ত্রীশিক্ষার প্রধান মন্দির গার্টন্-কলেজ স্থাপিত হইলে দ্বিতীয়া মিসেস্ ম্যানিং ইহার অবৈতনিক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। কুমারী ম্যানিং তখন অধিক বয়স্কা হইয়াও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহাতিশয়বশতঃ এই কলেজের ছাত্রীশ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ তিনি ইহার অধ্যক্ষ-সভার সভ্য হইলেন। এই কলেজের উপর তাঁহার আজীবন প্রীতি ছিল। তিনি ইহার জন্য তাঁহার সম্পত্তি হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

১৮৭০ সালে বৃষ্টল নগরে "জাতীয় ভারত সভা" নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে ছিলেন ও উৎসাহের সহিত এই সভার প্রতিষ্ঠা কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য বিবিধ উপায়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধন। কুমারী কার্পেণ্টার ইহার প্রথম সম্পাদিকা হন। লণ্ডনে ইহার একটী শাখা স্থাপিত হয়। প্রথমে মিসেস্ ম্যানিং, তৎপরে অল্প দিন মধ্যেই এই মহিলার মৃত্যু হওয়াতে কুমারী ম্যানিং এই শাখার সম্পাদিকা হন। তখন হইতেই ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ। ১৮৭৭ সালে কুমারী কার্পেণ্টারের স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে কুমারী ম্যানিং "জাতীয় ভারত-সভার" সম্পাদিকা নিযুক্ত হইলেন এবং বৃষ্টল ও লণ্ডনের কমিটিদ্বয় একীভূত হইল। এই সময় হইতে বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই মাস পর্য্যন্ত কুমারী ম্যানিং প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অক্লান্তভাবে ভারতের সেবা করিয়াছেন। "জাতীয় ভারত-সভা" প্রধানতঃ এই কয়েক প্রকারে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন:—প্রথমতঃ, চিন্তাশীল ও জনহিতৈষী ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলাদিগকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করা। এই উদ্দেশ্যে সভা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা বা সামাজিক সম্মিলনের আয়োজন করিয়া ইংরেজ ও ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে মিলিত করিতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়তঃ, "ইণ্ডিয়ান্ ম্যাগাজীন্ য়্যাণ্ড্ রিভিউ" নামক একখানা মাসিক পত্র প্রচার। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় যুবকদিগের তত্ত্বাবধান ও নানা উপায়ে তাঁহাদের উপকার-সাধন। চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষে বালিকা ও মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন, ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদিগকে বৃত্তি ও পুরস্কার দান ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে ভারতীয় রমণী-দিগের উন্নতি-সাধন। কুমারী ম্যানিং এবম্বিধ সকল কার্য্যেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৃহ ইংলণ্ড-প্রবাসী শিক্ষার্থী ও ভ্রমণকারী ভারতবাসী-দিগের একটী শান্তির আলয়স্বরূপ ছিল। অনেক ভারতবাসীর হৃদয়ের অতি উচ্চস্থানে তাঁহার প্রেমময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভারতবাসীর হৃদয়ে তাঁহার এই উচ্চ স্থান লাভের একটী বিশেষ কারণ এই ছিল যে ভারতবাসীর সহিত তাঁহার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপেই অহংকার-বর্জ্জিত ছিল। অনেক ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা প্রেমিক ও উদার হইলেও এই ভাবটী পরিত্যাগ করিতে পারেন না যে তাঁহারা উচ্চজাতীয়, আর ভারতবাসীর

সহিত আলাপাদি করিতে যাইয়া তাঁহারা সভ্যতার নিম্নতর সোপানস্থিত একটী হীন জাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এই ভাবের গন্ধ পাইলে অনুগৃহীত ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় বিশেষ আঘাত পড়ে। কুমারী ম্যানিঙের মনে এই ভাবের লেশমাত্রও ছিল না। মাননীয় আমির আলি সাহেব তাঁহার লিখিত স্মৃতিলিপিতে এই কথার বিশেষ সাক্ষ্য দিয়াছেন। যাহা হউক, সভার দ্বিতীয় কার্য্য—মাসিক পত্র-সম্পাদন—কুমারী ম্যানিং অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। "ইণ্ডিয়ান্ ম্যাগাজীন্ য়্যাণ্ড্ রিভিউ" ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া এবং ভারতের সংবাদ ইংলণ্ডে লইয়া ও ইংলণ্ডের সংবাদ ভারতে আনিয়া ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে একটী সুদৃঢ় বন্ধনসূত্র স্বরূপ হইয়া আছে। তৎপর, জাতীয় ভারত-সভার উপরি-উক্ত চতুর্থ কার্য্যে ভারতের কত বালিকা ও মহিলা যে উপকৃত হইয়াছেন তাহা কেবল একটী বিস্তৃত বিবরণীতেই দেওয়া যাইতে পারে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে বরাহনগরের হিন্দু বিধবাশ্রম সভার যত্ন ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কুমারী ম্যানিং দুইবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তাঁহার ভারতভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র সমূহের পর্য্যবেক্ষণ এবং নূতন কার্য্যক্ষেত্র স্থাপন। প্রথমে ১৮৮৮ সালে ও দ্বিতীয় বারে ১৮৯৯ সালে এদেশে তাঁহার শুভাগমন হয়। "ইণ্ডিয়ান্ ম্যাগাজীন্ য়্যাণ্ড্ রিভিউ" পত্রে তাঁহার ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই স্বলিখিত বিবরণে তিনি কেবল কার্য্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি সকল স্থানে ভারতহিতৈষী পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট যে সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রায় কিছুই উল্লেখ করেন নাই; তাহা কেবল তথনকার সাময়িক পত্র সমূহেই দ্রষ্টব্য। তিনি নিম্নলিখিত স্থান সকল পরিদর্শন করেন:—বোম্বাই, পুনা, হাইদরাবাদ (নিজামের রাজ্য) মান্দ্রাজ, মহীশূর, বেঙ্গালোর, কলিকাতা, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, আলিগড়, দিল্লি, লাহোর, আহম্মদাবাদ, জয়পুর, বরদা, সুরাট ও কাটিবার। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশটী বালিকা-বিদ্যালয় ও তদ্ভিন্ন অনেক কলেজ, চিকিৎসালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় ও দাতব্যশালা পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি এদেশে "জাতীয় ভারত সভার" নয়টী শাখা দেখিয়া যান।

১৯০৪ সালে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড্ তদীয় অভিষেক উপলক্ষে কুমারী ম্যানিংকে "কৈসরী-ই-হিন্দ্" নামক পদকে ভূষিত করেন। তথন কুমারী যেন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং উক্ত সালের "ইণ্ডিয়ান্ ম্যাগাজীনে"র অক্টোবর ও নবেম্বরের সংখ্যায় "জাতীয় ভারত-সভার" ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় সমগ্র কার্য্য সমালোচনাপূর্ব্বক দুটী প্রবন্ধ লেখেন। গত অক্টোবরের সংখ্যায় কুমারীর যে জীবনাখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে উক্ত প্রবন্ধদ্বয় অবশ্যই কুমারীর নিজলেখনী-প্রসূত, যেহেতু প্রবন্ধদ্বয়ের কুত্রাপি তদীয় নাম উল্লিখিত হয় নাই! যাহা হউক, অতঃপর এই ভারত ও নর-হিতৈষিণী আর অধিক দিন মর্ত্ত্যলোকে বাস করেন নাই। গত ১০ই আগষ্ট তাঁহার অমরাত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করে। তথন তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর।

আমি এই পুণ্যশ্লোক মহিলার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন ও তদীয় পবিত্র করস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার মহাব্রতের স্মৃতি আমার জীবন পথে একটি আলোক-রশ্মি-স্বরূপ। আমার অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা এই যে শিক্ষিতা ভারতবধূরা তাঁহাদের হৃদয়ও হস্তকে কেবল নিজ নিজ পরিবারের সেবায় আবদ্ধ না রাখিয়া স্বদেশের সেবায় প্রসারিত করেন, আর শিক্ষিতা ভারত-কুমারীগণের মধ্যে অনেকে দাম্পত্য সুখের জন্য আত্যন্তিক পিপাসু না হইয়া কুমারী ম্যানিঙের সদৃশা দেবকন্যার পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

—

জাপানে পাশ্চাত্য জাতি।

জাপান জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতায় ভারতবর্ষ ও চীনদেশের শিষ্যস্থানীয়, কিন্তু পাশ্চাত্য-সংসর্গ ও শিক্ষা এখন জাপানী-দিগকে এশিয়া মহাদেশের সর্ব্বপ্রধান জাতিতে পরিণত করিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীয়েরা বণিক-বেশে এশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল, ভারতে তাহারা বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছে, আর জাপানে সেই কৃপাভিখারী বণিকই রহিয়াছে। জাপানের পাশ্চাত্য-সংসর্গের কৌতূহলপূর্ণ বিবরণ পাঠ করিলে এই পার্থক্যের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো-পোলো তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জাপানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নানা কাল্পনিক বর্ণনায় অতি-রঞ্জিত। মার্কোপোলো লিখিয়াছেন, জাপানে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জাপানের রাজপ্রাসাদের উপরিভাগ, রাজার শয়নোপ-বেশনের আসনসমূহ, সকলই অকৃত্রিম স্বর্ণে নির্ম্মিত।

আসিকাগা সোগানদিগের প্রাধান্য-সময়ে তিন জন পলাতক পর্ত্তুগিজ জলপথে ভ্রমণকালে বায়ুতাড়িত হইয়া জাপানের দক্ষিণোপকূলে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিণাণ্ড মেণ্ডেজ পিন্টো নামক জনৈক পর্ত্তুগিজ বণিক সমুদ্রে পথভ্রষ্ট হইয়া জাপানে উপস্থিত হন। তিনিই জাপানের প্রকৃত অবস্থা ইউরোপে প্রথম প্রচার করেন। তিনি লিখিয়াছেন, চীনদেশীয়গণ নিপ্পন দ্বীপকে 'জিপানঙ্গু' অর্থাৎ সূর্য্যপুত্র বলে, এই 'জিপানঙ্গু' হইতে জাপান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কলম্বস আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করিলে তথাকার অধি-বাসিগণ তাঁহাকে অলৌকিক পুরুষ জ্ঞানে যেরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়াছিল, জাপানীগণও পিন্টোর প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। ভয়ে তাহারা প্রথমে পর্ত্তুগিজ-দিগের নিকটে যাইতে সাহস করিত না, কিন্তু তাহাদের সদয় ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া জাপানীগন ক্রমে তাহাদের সহিত মিশিতে ও বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল। পর্ত্তুগিজদিগের সদ্ব্যবহারে ও বাণিজ্যদ্রব্যে প্রীত হইয়া তাহারা পর্ত্তুগিজদিগকে প্রতিবৎসর কিউসিউ দ্বীপে একখানি বাণিজ্যপোত প্রেরণ করিতে অনুমতি দিল। এই জাহাজ প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের পর্ত্তুগিজ উপনিবেশ গোয়ানগরী হইতে জাপানীদিগের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদি ও নানাপ্রকার বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া কিউসিউ যাইত।

আন্‌সিরো নামক রাজদণ্ড-প্রাপ্ত জনৈক সম্ভ্রান্ত জাপানী পর্ত্তুগিজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোয়ায় পলায়ন করে ও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ফ্রান্সিস জেবিয়ার জাপানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রস্তুত হন এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আন্‌সিরোকে সঙ্গে লইয়া প্রচারার্থ জাপানে গমন করেন। জাপানী-দিগের সততা ও সাধু ব্যবহার দেখিয়া জেবিয়ার অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। জেবিয়ার তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী ও অতিশয় মহৎ লোক ছিলেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপন করেন ও সহস্র সহস্র লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য ইনি পরে "সেন্ট" অর্থাৎ সাধু এই সম্মানিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবল উৎসাহের সহিত জাপানের নানা স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, জাপানীরা প্রথমতঃ এই নবধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই, কিন্তু জেবিয়ারকে ধর্ম্মপ্রচারে কোন বাধাও দেয় নাই, যে সকল অধিবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল তাহারাও সমাজচ্যুত হইল না। জেবিয়ার ও তাঁহার সঙ্গীগণের অনেকেই চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, পীড়িত জাপানীদিগকে তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতেন; এই সকল সদ্ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে তাহারা আগ্রহের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। জেবি-য়ারের জাপান পরিত্যাগের অল্পকাল পরেই জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পর্ত্তুগিজ প্রচারকগণ দলে দলে জাপানে উপস্থিত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র লোকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল, একমাত্র কিয়োটোতেই

সাতটী গির্জ্জা নির্ম্মিত হইল। অমুরা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্বয়ং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও নবধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। নাগাসাকি সহরে বিদেশীয়গণ অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইল। বৌদ্ধ মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহার উপাদানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বাণিজ্য বিষয়েও পর্ত্তুগিজগণ যথেষ্ট লাভবান্ হইতে লাগিল। জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, পর্ত্তুগিজগণ জাপানে বাণিজ্যদ্বারা শতকরা শত মুদ্রা লাভ করিত, যদি তাহারা আরও বিশ বৎসর তথায় এরূপ বাণিজ্য করিতে পারিত তবে বাইবেলবর্ণিত রাজা সলোমন অপেক্ষাও তাহারা অধিক ধনশালী হইতে পারিত। তৎকালে পর্ত্তুগাল বাণিজ্য-প্রভাবে ইউরোপে অত্যন্ত ধনশালী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। অনেক পর্ত্তুগিজ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ধনবান্ জাপানীগণের কন্যা বিবাহ করিয়া সে দেশে অত্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।

কিন্তু ধর্ম্মযাজকদিগের দুর্ব্বুদ্ধিতায় জাপানে পর্ত্তুগিজদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য শীঘ্রই চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। পর্ত্তুগিজগণ রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। জেবিয়ার যতদিন জাপানে ছিলেন, তিনি নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মপ্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাজকগণ বিলাসী ও স্বার্থপর হইতে লাগিল এবং রাজ্য-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল; অধীনস্থ খৃষ্টান শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশে বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহারা দেশের প্রাচীন আচার ব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ এবং গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল কারণে পর্ত্তুগিজদিগের প্রতি জাপানীদিগের বিদ্বেষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অবশেষে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে একজন যাজকের ধৃষ্টতায় এই প্রধূমিত বিদ্বেষবহ্নি প্রবলভাবে জলিয়া উঠিল।

বুঙ্গো নগরের এক রাজপথে একদিন কোন প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত এক পর্ত্তুগিজ বিশপের সাক্ষাৎ হয়। যাজকগণ এই সময়ে এত বিলাস-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে বিনা শিবিকায় পথ চলিত না। দেশীয় প্রথা অনুসারে বিশপের শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া রাজকর্ম্মচারীকে সম্মান করা উচিত ছিল, কিন্তু দাম্ভিক বিশপ পূর্ব্বদেশীয় রাজকর্ম্মচারীকে সম্মান করা কেবল অনাবশ্যক মনে করিল না, দেশাচারজ্ঞ বাহকগণ ভয়ে দণ্ডায়মান হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক রাজকর্ম্মচারীর প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল। অপমানিত রাজকর্ম্মচারী নীরবে এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, বিশপের দাম্ভিকতার সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সম্রাট টাইকোর নিকট প্রেরণ করিলেন। টাইকো কৃতঘ্ন বিদেশীয়গণের রাজশক্তির প্রতি এরূপ অবমাননায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মপ্রচারকগণের পশ্চাতেই খৃষ্টীয় সৈন্যগণের আগমন ও দেশজয়ের বৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন, এখন পর্ত্তুগিজদিগকে নিজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণকে কুড়ি দিনের মধ্যে জাপান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মযাজকগণ অতঃপর সদ্ব্যবহার করিতে পারে, এই আশায় কিছুদিন এই ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। কিন্তু ইহাতে যাজকদিগের চৈতন্য হইল না, তাহাদের ঔদ্ধত্য ও অবিমৃশ্যকারিতা দূর হইল না। এই সময়ে আর একটী ঘটনা পর্ত্তুগিজদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিল।

ধর্ম্ম ও বাণিজ্য বিষয়ে সে সময়ে ওলন্দাজগণের সহিত পর্ত্তুগিজদিগের বিষম শত্রুতা ছিল। পর্ত্তুগিজদিগের একখানি বাণিজ্য-পোত জাপান হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ঐ জাহাজে কোন সম্ভ্রান্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাপানীর লিখিত স্বদেশদ্রোহিতাপূর্ণ একখানি পত্র পাওয়া যায়। ঐ পত্রে তিনি পর্ত্তুগালের রাজাকে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা সৈন্য প্রেরণ করিলে দেশীয় খৃষ্টানগণ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া

জাপানে পর্ত্তুগিজাধিকার স্থাপন করিবে এইরূপ পরামর্শ করিয়াছে, অতএব তিনি যেন অবিলম্বে জাপানে সৈন্য প্রেরণ করেন। ওলন্দাজগণ কালবিলম্ব না করিয়া এই পত্র জাপান গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিল। এই ঘটনায় সম্রাট টাইকো জাপান হইতে খ্রীষ্টান নাম মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিলেন যে, পর্ত্তুগিজেরা অবিলম্বে পরিবার ও দ্রব্যসামগ্রী লইয়া চিরকালের তরে জাপান পরিত্যাগ করিবে, জাপানের কোন পোত বা অধিবাসী আর বিদেশে যাইবে না, বিদেশ-প্রবাসী কোন জাপানীও আর স্বদেশে ফিরিতে পারিবে না, এই রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে ভদ্রাভদ্র, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে, কোন কারণে এই অপরাধের ক্ষমা হইবে না, বিদেশ-জাত দ্রব্য আর জাপানে বিক্রয় হইবে না, হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই গুরুতর দণ্ড পাইবে। বিদেশী পত্র কোনও প্রকারে জাপানের ভূমি স্পর্শ করিবে না, যদি কাহারও বাটীতে বিদেশীর লিখিত কোন পত্র পাওয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তি সপরিবারে নিহত হইবে। জাপানে আর কেহ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবে না অথবা খৃষ্টান নাম ধারণ করিতে পারিবে না। এক পক্ষ পরে কি স্বদেশী কি বিদেশী, যাজক উপাধিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে যে কেহ ধরিয়া দিতে পারিবে, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবেন। টাইকো অতি নৃশংস-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার আদেশে প্রায় কুড়ি হাজার খৃষ্টান নির্দ্দয় ভাবে নিহত হইল, চিরকালের মত জাপানে পর্ত্তুগিজ আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। নিহত জাপানীগণ খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অপূর্ব্ব বিশ্বাস দেখাইয়াছিল, খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই তাহাদের প্রাণরক্ষা হইত, কিন্তু তাহারা কিছুতেই ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে নাই, জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আবালবৃদ্ধবণিতা অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

টাইকোর মৃত্যুর পর খৃষ্টান-নির্য্যাতন অল্পকালের জন্য কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল, তাঁহার পরবর্ত্তী সোগান ইয়েয়াসু কিছুদিন খৃষ্টানদিগকে কোন উপদ্রব করেন নাই, কিন্তু ক্রমে তাঁহারও ধারণা জন্মিল যে খৃষ্টানদিগের শ্রীবৃদ্ধি জাপানের পক্ষে কল্যাণকর নহে। সুতরাং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জাপানীদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। ঐ সময়ে প্রোটেষ্টাণ্ট ওলন্দাজগণ জাপানে বিশেষ আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। রোমান-ক্যাথলিক পর্ত্তুগিজগণের সহিত তাহাদিগের ঘোর শত্রুতা ছিল। তাহারাও সোগানকে ক্যাথলিক যাজকদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। খৃষ্টানদিগের প্রতি পুনরায় দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। দলে দলে খৃষ্টানগণ নিহত হইতে লাগিল। সেই ভীষণ উৎপীড়ন-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, জাপানীগণের অদ্ভুত ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এক প্রহ্লাদের কাহিনী লইয়া আমরা কত গৌরব করি, জাপানে সহস্র সহস্র বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ ধর্ম্মের জন্য কঠোর যাতনা সহিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শত শত খৃষ্টানকে উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, শত শত লোককে জীবন্ত দাহ করা হইয়াছে, ক্রোধোন্মত্ত বলীবর্দ্দের সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহার শৃঙ্গাঘাতে কত খৃষ্টানকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। শত শত খৃষ্টানকে থলের মধ্যে পূরিয়া সেই সকল থলে একত্র পুঞ্জীকৃত করিয়া দগ্ধ করা হইয়াছে। কত লোকের হস্তপদের নখের নিম্নে তীক্ষ্ণ শলাকা বিদ্ধ করিয়া নিদারুণ যাতনা দেওয়া হইয়াছে। কত হতভাগ্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া অনতিদূরে খাদ্য রাখিয়া অনাহারে হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাপানীগণ ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। অল্পবয়স্ক বালকবালিকা পর্য্যন্ত সরল বিশ্বাসের সহিত অকাতরে নৃশংস মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে। এই প্রকার দৃষ্টান্ত ইউরোপেও কখনও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।

অবশেষে দৌরাত্ম্য ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশীয় খৃষ্টানগণ রাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা সিম্বারা দ্বীপে একটী পুরাতন দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিল। তৎকালীন

সোগান ইয়েমিৎসু তাহাদিগের দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা অসীম সাহসের সহিত ১০২ দিন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিল, রাজ-সৈন্য পরাস্ত হইল। তখন সোগান জাপানপ্রবাসী ওলন্দাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কুকিবার নামক একব্যক্তি তখন জাপানের ওলন্দাজ কুঠির কর্ত্তা ছিলেন, তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য ও কামান লইয়া বিদ্রোহীদিগের দুর্গ অবরোধ করিলেন। এক পক্ষকাল অবরোধের পর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অনেক বিদ্রোহী প্রাণত্যাগ করিল। তখন কয়েকটা তোপ লইয়া কুকিবার সিম্বারায় প্রবেশ করতঃ অবশিষ্ট বিদ্রোহীদিগকে বিনাশ করিল। কয়েকটী বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোককে একটী গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারাই কেবল বাঁচিয়া রহিল। ইহাদিগের ভাবী সন্তানগণ জাপানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবে, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকেও সমূলে বিনষ্ট করা হইল। অর্থগৃধ্নু কুকিবার রাজপ্রীতি সাধনার্থে যে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে নরাকার রাক্ষস নামে অভিহিত করিয়াছিল। সোগানের মনস্তুষ্টির জন্য এত পাশবিক কার্য্য করিয়াও ওলন্দাজগণ লাভবান হইতে পারিল না। আমরা বারান্তরে জাপানে ওলন্দাজ-গণের অভ্যুদয়ের বিষয় আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

দেবী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শৈলবালা এতক্ষণ স্বদেশী আন্দোলনের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এখন এক খানা খাতা বাহির করিয়া লিখিতে লাগিলেন :—

জননীর ডাকে যদি জেগে থাকে
হৃদয়ে সংকল্প নব,
তবে আপনার স্বার্থ লয়ে আর
কেন মিছে পড়ে রব?
ঐ স্বদেশের শুনি জয়গান,
মা'র কাজে ধায় মায়ের সন্তান;
মায়ের সেবায় সঁপিয়া পরাণ
সকলে কৃতার্থ হব।
সুখে মগ্ন হয়ে কে থাকিতে চায়,
আত্মদান বিনা মহত্ত্ব কোথায়?
এস আজি তবে, ত্যাগ-মন্ত্র সবে
মরমে আঁকিয়া লব।
জননীর ডাকে যদি জেগে থাকে
হৃদয়ে সংকল্প নব।

এইটুকু লিখিতে লিখিতেই শৈলবালার স্বামী নরেন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্র বাবু সরকারী উকীল, সাহেব-সুবার অনুগত; সম্প্রতি একটি রায় বাহাদুর উপাধির জন্য লালায়িত। সুতরাং তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী। সেইজন্য শৈলবালা স্বামীকে দেখিয়াই খাতাখানা লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র বাবুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাহা ধরা পড়িল; নরেন্দ্র বাবু কহিলেন,—

"খাতাখানা লুকাও কেন? কি লিখেছ, দেখাও না?"

শৈল। কেন দেখাব?

নরেন। আমি দেখ্‌তে চাই বলে।

শৈল। দেখাতে ইচ্ছা যদি না-ই থাকে?

নরেন। না থাকে না-ই দেখ্‌লাম; কি লিখ্‌ছিলে আমি বুঝি আর তা বুঝ্‌তে পারি নাই!

শৈল। কি বুঝ্‌তে পেরেছ, বল না?

নরেন। আচ্ছা শোন বল্‌ছি;—নিশ্চয়ই তুমি বিরহ-সঙ্গীত লিখ্‌ছিলে।

শৈল। প্রাণেশ্বর ত সশরীরে সম্মুখেই বর্ত্তমান। কোন্ দুঃখে বিরহের গান লিখ্‌তে যাব?

নরেন। সম্প্রতি সম্মুখে বর্ত্তমান বটে; কিন্তু আর দুদিন পরেই ত পূজার ছুটি। তখন যে তিনি দার্জ্জিলিং যাবেন। তুমি সেই ভাবী বিরহ কল্পনা করে কাতর হচ্ছ, আর বসে বসে বিচ্ছেদের কবিতা লিখ্‌চ!

শৈল। তুমি দার্জ্জিলিং যাবে! কেন যাবে?

নরেন। ছোট লাটের সঙ্গে দেখা করতে।

শৈল। আমি তোমাকে যেতে দিব না।

নরেন।—

যেতে নাহি দিবে ? কেন প্রিয়তমে ? হেথা
তুমি রবে একা, আমি যাব দূরে ; হায় !
শূন্য গৃহে দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে,—
তাই ভাবি হতেছ কাতর ? ধৈর্য্যধর ;
আমি মাত্র সবে দশ দিন থাকিব সে
শৈলপুরে। তার পর হে মনোমোহিনি,
মমচিত্ত-বিমুগ্ধ-কারিণি, এসে কাছে,
হেরিব ও ফুল্ল-শতদল-তুল্য রম্য
প্রেমানন !—

শৈলবালা হাসিয়া কহিল—"বাপ্‌রে তুমি যে একজন মস্ত কবি হয়ে উঠ্‌লে—দিনে দুপুরে কবিতা বল্‌চ !"

নরেন। তুমি কত কাগজে কবিতা লিখ্‌চ, আর তোমার সংসর্গে থেকে আমি দুলাইন কবিতা আবৃত্তি করতেও পারব না ?

শৈল। ঠাট্টা রাখ। দেশের লোক যাঁর ব্যবহারে হাড়ে চটা, তুমি যাবে তাঁকে সেলাম ঠুকে অনুগ্রহ আদায় করতে ? তা আমার সহ্য হবে না।

নরেন। তা না হ'লে রায় বাহাদুর হই কি করে ? দেখ, আমি তোমাকে অর্থ দিয়ে সুখী করেছি, এখন যদি তুমি রায় বাহাদুরের পত্নী বলে গর্ব্বিতা হতে পার, তা হলেই আমার জীবন ধন্য !

শৈল। কি ! তুমি মনে কর আমি রায় বাহাদুরের স্ত্রী বলে গর্ব্ব করব ? তা হলে লজ্জায় আমি মরে যাব। যে গবর্ণমেন্ট আমাদের মাতৃভূমির উপর খাঁড়া তুলেচে, অখণ্ড বাঙ্গালা দেশটিকে কেটে দ্বিখণ্ড কচ্চে, আমি সেই গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে গর্ব্বিতা হব ? ধিক্‌ আমাকে !

হায়, নরেন বাবু দিবারাত্রি আপনার মক্কেলের মোকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন ; তাঁহার সুশিক্ষিতা পত্নী যে স্বদেশী আন্দোলনে কতটা উত্তেজিত হইয়াছেন, তাহার খবরই রাখেন না।

নরেন বাবু বুঝিতে পারিলেন, এখন ওকথাটা চাপা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাই তিনি বলিলেন—

"ভাল কথা, সেই চৌধুরীদের মোকদ্দমায় যে জিতেছি, তা বুঝি তুমি শোন নাই। তাঁরা আমাকে সাত হাজার টাকা দিয়েছেন।"

শৈল। ও মা, তাই নাকি ! তবে ত বেশ হ'য়েচে। এখন আমাকে কি দিবে দাও ? তুমি ত বলেছিলে, মোকদ্দমায় জিত্‌তে পারে আমার হাতে কিছু টাকা দিবে।

নরেন। তোমাকে সব টাকাই দিব।

শৈল। আজই দাও।

নরেন। নগদ টাকা দিচ্ছি নে।

শৈল। কেন ?

নরেন। নগদ কত টাকা দিয়েচি, হিসাব রাখ ? হাতে ত কিছুই রাখ্‌তে পার না। তাই তোমার হাতে আর টাকা রাখি না।

শৈল। হাতে টাকা থাকে না, তা সত্য। তা বলে আমি ত আর কোন অন্যায় খরচ করি না ?

নরেন। ন্যায় অন্যায় বিচার করা ভারি শক্ত। দুঃখীদের জন্য প্রাণ কাঁদা ভাল ; দেশের কাজে অর্থ সাহায্য করাও ভাল ; কিন্তু তারও ত একটা হিসাব থাকা চাই। তোমার হাতে টাকা এলেই যে মানুষকে তা দিয়ে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হও, সেও কি ভাল ?

শৈল। না দিয়ে কি করি ? একটা ছেলের টাকার অভাবে পড়া হবে না ; একটা ভাল কাজ টাকার অভাবে পণ্ড হয়ে যাবে, আর আমি সিন্ধুকে টাকা পুরে বেশ শক্ত করে তার তালা চাবি বন্ধ করব ? তা হলে সমাজে না থেকে বনের জানোয়ারের সঙ্গে মিশ্‌লেই ত হয়।

নরেন। তোমার সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠবে ? তা আমি কিছুতেই তোমার হাতে নগদ টাকা দিচ্ছিনে। সহরের ছোঁড়াগুলা "স্বদেশ" "স্বদেশ" করে ক্ষেপেছে, একটা কাপড়ের কল কিন্‌বার জন্য টাকা তুল্‌চে। তুমি যে তাদের আরো ক্ষেপিয়ে তুল্‌বার জন্য টাকা দিতে

চাচ্ছ, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি! কক্ষনো তোমার হাতে টাকা দিব না। এবার কলিকাতায় হ্যামিলটনের দোকানে বড় সুন্দর নেক্‌লেস্‌ এবং আরো দু এক রকম নূতন ধরণের গহনা দেখে এসেছি, তাই কিনে দিব।

বুদ্ধিমতী শৈলবালা বুঝিল, সে যতই কথার কাটাকাটি করুক না কেন, নগদ টাকা আর কিছুতেই পাইবার আশা নাই। কাজেই গহনা অবলম্বন করিয়া টাকাটা হাত করাই ভাল। তাই কহিল—

"আচ্ছা, আমাকে সাত হাজার টাকার গহনাই দিও। কিন্তু সাহেবের দোকানের গহনা কেন? দেশেরই একজন স্বর্ণকার ডেকে গহনার ফরমাস দিলে কি হয় না?"

নরেন। তুমি দিন দিন কি হচ্চ বল দেখি? সাত হাজার টাকা খরচ করে দেশী স্যাকরা ডেকে গয়না গড়াবে? তা যদি মল টল পর্‌তে চাও ত বল, একটা স্যাকরা ডেকে বায়না দিচ্ছি!

শৈলবালার টাকার বড়ই দরকার। কাজেই তিনি স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। নরেন বাবু কলিকাতার হ্যামিলটনের দোকানে গহনার ফরমাস পাঠাইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গোপী বাবু সবজজ গুড়গুড়ির নলটি মুখে দিয়া কাগজ পত্র পড়িতে ছিলেন। আজ রবিবার; তাই গল্প করিবার মতলবে উকীল নরেন বাবু তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপী বাবু বলিলেন, "এস ভায়া, এস, তুমি যে অনেকদিন বেঁচে থাক্‌বে দেখ্‌চি; এইমাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল।"

নরেন। সহরের ছোঁড়াগুলা ত আমাকে যমের বাড়ী পাঠাবারই কামনা কচ্চে। আর আপনি বল্‌ছেন আমি অনেকদিন বেঁচে থাকব!

গোপী বাবু। হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছ। ছোঁড়াগুলা তোমার পেছনে বড় লেগেছে। ইংরেজদের পোষ্যপুত্র বলে তোমার নামে ছড়া বেঁধেছে। তা ভায়া, তুমিও ত নির্দ্দোষী নও। আমরা সরকারের চাকর হয়ে বিলাতী জিনিস ছাড়তে পেরেছি, আর তুমি উকীল হয়ে ভয় পাচ্ছ? দেশের দুর্গতি ত দেখ্‌ছ; উঠ্‌তে বস্‌তে, চল্‌তে ফির্‌তে বিদেশী জিনিষ না হলে চলে না। এদিকে দেশের লোক অন্ন পায় না—দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে; ওদিকে বিদেশী বণিকেরা আমাদের কাণ মলে কোটি কোটি টাকা দেশে নিয়ে যাচ্ছে। বলতে হবে সুসময়েই লোকের চোখ ফুটেছে। নইলে বিদেশী ব্যবসায়ীদের কৃপায় জগতের ইতিহাস হতেই আমাদিগকে লুপ্ত হতে হত।

নরেন। যা বল্‌চেন সবই সত্য, সবই আমি বুঝ্‌তে পারি; কিন্তু বুঝেও কোন লাভ নাই।

গোপী বাবু। কেন?

নরেন। আপনি বয়সে আমার পিতৃতুল্য। আপনার কাছে গোপন করে লাভ কি? শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করে যে মাটি খেয়েচি, তা'ত কাকেও খুলে বল্‌তে পারি না; কেবল নিজের মনের আগুনে নিজেই জলে পুড়ে মর্‌চি।

গোপীবাবু। সে কি?

নরেন। পাশ করা স্ত্রী;—কাজেই ঘাড়ে চেপে বসেছেন। যে আদেশ করবেন, তা পালন করতে না পার্‌লে আর রক্ষা নেই; যে ধুয়া ধরবেন, তার মত কাজ না হলে আর গৃহে শান্তি থাক্‌বে না। আমি ত স্বদেশী আন্দোলনের সুরু হতেই দেশী জিনিস ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তাতে শিক্ষিতা পত্নীর মন উঠল কোথায়? তিনি ইচ্ছা কল্লে বরং আমাকে ছাড়্‌তে পারেন, তবুও বিদেশী জিনিস ছাড়্‌তে রাজি নন। বলেন, লেখা পড়া শিখে কি যাব জোলার কাপড় পর্‌তে! এই দেখুন না কেন, আমার অজ্ঞাতসারে হ্যামিলটনের বাড়ী সাত হাজার টাকার গয়নার ফরমাস করে বসে আছেন!

গোপীবাবু। থাম ভায়া, আর বল না। বঙ্কিম বাবু বলেছেন, সকল জ্যোঠা দেখ্‌তে পারি, মেয়ে জ্যেঠা দেখ্‌তে পারি না। আমারো সেই কথা। তুমি হাকিমকে ধোঁকা দিয়ে মক্কেলের মোকদ্দমা ত বেশ মেরে নিচ্ছ

পার; আর নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পেরে ওঠ না? আ ছিঃ ছিঃ, আমি আরো মনে কর্‌তাম, তোমার স্ত্রীটি বড় লক্ষ্মী মেয়ে; তাঁর মনে দয়াধর্ম্মের অভাব নেই।

নরেন। বাজারে গুজব সেই রকমই বটে; কিন্তু বিলাতী দ্রব্যের পক্ষপাতী বলে, তাঁর যে দয়াধর্ম্ম নেই, এমন কথা বলা যায় না।

গোপীবাবু। ও কথা রেখে দাও, অন্য কথা বল।

নরেন। রেখে দাও বল্লে চল্‌বে কেন? এই যে দেশের লোক "স্বদেশী জিনিস" "স্বদেশী জিনিস" বলে ক্ষেপে উঠেছে, মেয়েরাই যে তাদের মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাল্‌বে, তাদের সকল চেষ্টা পণ্ড করে দিবে। মেয়েদের যে বিলাসিতা বেড়েছে, বিলাতি জিনিস না পেলে কি তাদের মন উঠ্‌বে? তাদের মন না উঠলে পুরুষদের যে ঘরে বাইরে দুদিকেই আগুন জলে উঠ্‌বে।

গোপী বাবু। সে জন্য ভেব না; তোমার মত সকলের ভাগ্যে শিক্ষিতা স্ত্রীও জোটে নাই; আর বোধ হয় সকলে তোমার মত স্ত্রী-ভক্ত ও নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহরের লোকেরা সহরে একটি কাপড়ের কল স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহারা বিস্তর চেষ্টা করিয়া অনেক টাকাও তুলিয়াছেন। কিন্তু এখনো আর পঁচিশ হাজার টাকা তুলিতে না পারিলে কলের কাজ আরম্ভ হইবে না। সেই টাকা তুলিবার জন্য আজ এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভায় শুধু যে পুরুষেরাই আসিয়াছেন, তাহা নয়। অন্তঃপুরের শত শত পুরমহিলা আসিয়া চিকের অন্তরালে বসিয়া গিয়াছেন। সহরের সর্ব্বজনপ্রিয় অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হরিহর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

সভায় সঙ্গীত হইল, রচনা পাঠ হইল, কোন কোন বক্তা বক্তৃতাও করিলেন। তৎপরে সহরের সুবক্তা শরৎ বাবু তাঁহার মধুর কণ্ঠের স্বর-লহরী সপ্তমে তুলিয়া মহিলাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

"হে বঙ্গীয় কুলললনাগণ, আজ যদিও দেশের পুরুষেরা সম্মানচ্যুত, গৌরবভ্রষ্ট, স্বার্থমগ্ন, নিজেদের ভোগবিলাস লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, তথাপি তোমাদের দয়া-ধর্ম্ম অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ; তোমাদের হৃদয়ের মহত্ব আজিও অতুলনীয়; অদ্যাপি তোমরা নারীমহিমায় গৌরবান্বিতা। তোমাদের নিষ্কাম সেবা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়? আজ তোমরা তোমাদের করুণাপূর্ণ নয়নে একবার চাহিয়া দেখ—জননী জন্মভূমির কি দুর্গতি! এই দুর্গতি দেখিয়া পুরুষের কঠোর চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে; তাঁহাদের স্বার্থজাল ছিন্ন হইয়াছে; তাঁহাদের অন্তরে মহৎ সংকল্পের উদয় হইয়াছে; তাঁহারা অকাতরে দেশের কার্য্যে জীবন দান করিতেছেন, আর আজ করুণ-হৃদয়া মাতৃস্বরূপিনী বঙ্গরমণীগণের অন্তঃকরণ কি একবারও দেশের জন্য কাঁদিয়া উঠিবে না? তাঁহারা তাঁহাদের সুকুমার দেহলতা হইতে একখানি স্বর্ণাভরণ উন্মুক্ত করিয়াও কি দেশের কার্য্যে দান করিতে পারিবেন না?

"হায়, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই সহরে যে রমণী শিক্ষা গর্ব্বে গর্ব্বিত, যিনি সাহিত্যে সংবাদপত্রে প্রতিদিন দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা অবগত হইতেছেন; আজ সেই বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃত-হৃদয়া রমণী স্বজাতিদ্রোহ-কলঙ্কে কলঙ্কিনী—আজ তিনি মাতৃঘাতিনী! আজ সেই হৃদয়হীনা নারী জননী জন্মভূমির আর্ত্তনাদে বধির হইয়া, লক্ষ লক্ষ লোকের অনুরোধে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া, আপনার বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য সাহেবের দোকানের সাত হাজার টাকার বিলাতি গহনা কিনিয়াছেন এবং স্বামীকে প্রতিদিনই বিলাতি জিনিস কিনিতে বাধ্য করিতেছেন! হা সংস্কারপ্রিয় যুবকগণ, এই ত তোমাদের স্ত্রীশিক্ষার ফল! এখনো কি তোমাদের চক্ষু ফুটিবে না? এখনো কি নারীদিগের শিক্ষার জন্য তোমরা ব্যগ্র হইবে?"

সভার শত শত শ্রোতা উত্তেজিত হইয়া, সভাগৃহ কম্পিত করিয়া, সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ধিক্ স্ত্রীশিক্ষায়, ধিক্ শিক্ষিতা নারীকে! না, আমরা কেহই আর

রমণীদিগকে শিক্ষা দিতে চাহি না। আমরা আজই বালিকা-বিদ্যালয় উঠাইয়া দিব।"

ইহার পর শচীন্দ্র নামক শৈলবালার একটি আত্মীয় যুবক উঠিয়া বলিতে লাগিলেন;—"প্রকাশ্য সভায় আমি কখনো কিছু বলি না। কিন্তু আজ এই সভায় আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা ভ্রমবশতঃ অসত্য ও গ্লানিপূর্ণ ভাবাদ্বারা এক করুণহৃদয়া রমণীকে তাঁহার মহিমা-মণ্ডিত অত্যুচ্চ গৌরবের ভূমি হইতে নিম্নে নামাইয়া আনিয়াছেন; সত্যের অনুরোধে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করা আবশ্যক হইয়াছে। নচেৎ ধর্ম্মের অভিসম্পাতে আমাদের এই সভার সমস্ত কার্য্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

"আপনারা এই মাত্র যে স্ত্রীশিক্ষায় ধিক্কার দিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেশকে কি আলোকের দ্বারা উজ্জ্বল করিতে চাহেন, না দেশের অন্ধকারের স্তরকে নিবিড় অন্ধকারের দ্বারা আরো নিবিড়তর করিয়া তুলিতে চাহেন? আজ শিক্ষার আলোক আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই না আমরা স্বদেশের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি? দেশে ত লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত কৃষক রহিয়াছে; তাহারা কি মাতৃভূমিকে ভালবাসে না? কাহার সাধ্য তাহাদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ ঘোষণা করে? তাহারা শিক্ষা পায় নাই, তাহারা দেশের কথা বুঝিতে পারে না বলিয়াই আমাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে পারে না। সেইরূপ রমণীরা যতই শিক্ষা পাইবেন, ততই পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেশের দুর্গতি দূর করিতে পারিবেন। যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবেন, তাঁহারা মাতৃভূমির অন্তর্নিহিত বেদনাই ভাল করিয়া বুঝিবেন না, দেশের জন্য আর বেশী কি করিবেন?

"আপনারা সকলেই জানেন, আজ পর্য্যন্ত এই সভা যত টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার দশমাংশের একাংশ আমার সাহায্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না, যে এতক্ষণ যে শিক্ষিতা রমণীর নামে ধিক্কার দিলেন, তাঁহার স্বামী স্বদেশী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া, তিনি তাঁহাকে না জানাইয়া গোপনে আপনার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি এই সভার কার্য্যে দান করিয়াছেন। এমন ভাবে দান করিয়াছেন, যে আজ যদি তাঁহার স্বামী কোন ধনীর গৃহের উৎসবে, তাঁহাকে স্বর্ণাভারণে বিভূষিতা হইয়া যাইতে আদেশ করেন, তাহা হইলে তিনি হাতে পরিবার জন্য কয়েকগাছা সোণার চুড়িও আপনার অলঙ্কারের বাক্সে খুঁজিয়া পাইবেন না। হয়ত এজন্য বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে তাহার স্বামীর নিকট তিরস্কার ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে।"

সভার লোক আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, আবার সকলে সমস্বরে বলিলেন, "এ রমণী মানবী নয়, দেবী; আমরা আজ দেবীর নিন্দা করিয়া অপরাধী হইয়াছি।"

শচীন্দ্র নিজের পকেট হইতে কতকগুলি মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার বাহির করিয়া কহিলেন, "শরৎ বাবু সাহেবের দোকানের যে গহনার কথা বলিলেন, এই দেখুন সেই গহনা। অপানাদের সভার কাজে দান করিবার জন্যই সেই শিক্ষিতা রমণী গহনাগুলি আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আমার রহস্যপ্রিয় বন্ধু শরৎ বাবু হয় ত বলিবেন—নিশ্চয়ই এই সভাগৃহ একটি বিলাসিনী রমণী নহেন যে, তাঁহার স্বর্ণাঙ্গে পরাইবার জন্য সাহেব বাড়ীর এই স্বর্ণাভরণের প্রয়োজন আছে। ইহার উত্তর এই যে, শৈলবালা দেবীকে অনেকে ধনীর কন্যা, ধনীর পুত্রবধূ এবং পসারওয়ালা উকীলের স্ত্রী বলিয়াই জানেন; কিন্তু তিনি যে সহরের অনেক দীনদুঃখিনীর জননী, তাহা কেহই জানেন না। সেই জন্য তাঁহার হস্তে একটি পয়সাও সঞ্চিত থাকে না। অথচ স্বদেশী আন্দোলনের নামে তাঁহার স্বামীর কাছেও কিছু পাইবার আশা নাই। তাই তিনি কৌশলে কিছু টাকা হাত করিবার মতলবে স্বামীর প্রদত্ত সাহেবের দোকানের বিলাতী গহনাই গ্রহণ করিয়াছেন; আর আজ স্বামীর অজ্ঞাতসারেই তাহা দেশের কার্য্যে দান করিতেছেন!"

শৈলবালার এই আশ্চর্য্য আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া সভার লোক স্তম্ভিত হইল। সভার একজন প্রবীণব্যক্তি উঠিয়া বলিলেন, "আমরা জানি, শৈলবালা দেবী কলিকাতায় তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়া পুরুষদিগের অনেক সভায়

প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করিয়া থাকেন। সেইজন্য বলি, তাঁহাকে একটি প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করা হউক, এবং ভ্রমক্রমে তাঁহার প্রতি যে অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হউক।"

শচীন্দ্র বাবু কহিলেন, "শৈলবালা দেবী আজ এই সভায় উপস্থিত আছেন, তিনি চিকের আড়ালে বসিয়াছেন। আপনারা ইচ্ছা করিলে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতে পারেন।"

শৈলবালা চিকের আড়ালে আছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ সভাপতি ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন,—মা, শৈলবালা, আমি তোমাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেছি। আজ তোমার এই সন্তানের অনুরোধ না রাখিলে চলিবে না;—তোমাকে একবার সভার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। মা, তোমার কাছে আবার ক্ষমা প্রার্থনা কি? আজ তোমার করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে শিখুক।"

লজ্জায় শৈলবালার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল—ইহার চেয়ে নিন্দাই যে তাহার ভাল ছিল। শৈলবালা কিছুতেই সভার মাঝখানে দাঁড়াইতে সম্মত হইলেন না।

অবশেষে সভার সমস্ত লোকের একান্ত অনুরোধে শৈলবালা চিকের বাহিরে একটি প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী দেবী প্রতিমার নিরুপম মুখশ্রী হইতে এমন এক অপার্থিব জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল, যে সভার লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল; সকলেরই মনে হইতে লাগিল,—যেন জননী জন্মভূমি আজ বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সন্তানদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন! বৃদ্ধ সভাপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া ভক্তিবিগলিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"মা জগদম্বা, তোমাকে অনেক ডাকিয়াছি, কিন্তু ডাকিয়া দেখা পাই নাই। আজ কি তুমি দেশের কাজে কিছু চাহিবার জন্য এই পুণ্যবতী নারীর মধ্য দিয়া দেখা দিলে? মা, এই গরীব ব্রাহ্মণের কি আছে, যে দেশের সেবায় অর্পণ করিবে? আর ত কিছুই নাই, থাকার মধ্যে একটু ব্রহ্মোত্তর জমি;—তবে লও মা, আজ দেশের কাজে সেই জমিটুকুই উৎসর্গ করিতেছি।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই ত্যাগের দৃষ্টান্তে সভার মধ্যে এক তাড়িৎ প্রবাহিত হইল। সকলেই বলিয়া উঠিল—"আজ সত্য সত্যই দেবী দুর্গতি-হারিণী দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য দয়াশীলা নারীরূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। আজ এস, আমরা সকলে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ত্যাগমন্ত্র গ্রহণ করি।"

এই কথা বলিতে বলিতেই একজন স্বার্থপর কৃপণ জমিদার শৈলবালার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল—"মা, আমি শুধু মানুষের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেই শিখিয়াছি, মানুষকে কিছুই ত দিতে শিখি নাই। আজ তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আমার এ বৎসরের অর্দ্ধেক আয় স্বদেশের সেবায় অর্পণ করিব।"

অতঃপর সভার অধিকাংশ লোকই শৈলবালার পা ছুঁইয়া জননী জন্মভূমির সেবায় আপনাদিগের সঞ্চিত অর্থ ও শরীরের শক্তি সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইল, এবং তাঁহারা কি এক অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা যন্ত্রবৎ চালিত হইয়া শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল! শৈলবালা এতক্ষণ নির্জ্জীব পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন; এখন আর তাঁহার দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না; আশ্রয়-চ্যুত লতিকার ন্যায় সভার মাঝখানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

—

প্রাচীন ও নব্য ভারতে নারীজাতির অবস্থা।

শ্রীমতী কমলা সথিয়ানাধন এম, এ,-লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরবর্ত্তীকালে,—সূত্র ও মনুসংহিতার সময়ে—এই উন্নত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তখনও নারীগণ অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিতেন সত্য, কিন্তু এই সময়ে তাঁহাদের অবস্থার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল। ব্যবস্থাকর্ত্তা মনু লিখিয়াছেন, নারীর কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই এবং তিনি স্বাতন্ত্র্য লাভের অনুপযুক্ত। কিন্তু বোধ হয় মনু সমাজের তৎকালীন অবস্থা বর্ণন করেন নাই, ব্রাহ্মণগণ সমাজকে যে অবস্থায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন ইহা তাহারই আদর্শ। নারীগণ এই সময়ে পুরুষ-আত্মীয়গণের আশ্রিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, কিন্তু তাঁহারা যে পরিবারে ও সমাজে যথেষ্ট সম্মান পাইতেন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়। মনু বলেন, গুরু অপেক্ষা পিতা শতগুণে পূজনীয় এবং পিতা অপেক্ষা মাতা সহস্রগুণে পূজনীয়। এই উক্তি স্ত্রীলোকের উচ্চ সম্মানেরই পরিচায়ক। কিন্তু সময়ের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য বা অস্তিত্ব নাই, এই ধারণা এই যুগেই বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বৈদিক ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বাল্য বিবাহ অজ্ঞাত ছিল, বৌদ্ধ যুগে তাহা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে শাস্ত্রকারগন ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহা এতদূর বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে, নিতান্ত সাহসী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ এই রীতি অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না।

বৈদিক যুগে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ যুগে লোকে কেবল বালবিধবাদিগেরই বিবাহ অনুমোদন করিত। মনুর সময়েও বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ তাহা সমর্থন করিতেন না। ক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে লোকের প্রতিবাদ তীব্র হইয়া উঠে এবং ইহা সম্পূর্ণরূপ স্থগিত হয় ও লোমহর্ষণকর সতীদাহ প্রচলিত হয়। কিন্তু ইহা কখনই হিন্দু-প্রথা নহে, বৌদ্ধ যুগে সিথীয় আক্রমণকারীগণ কর্ত্তৃক এই প্রথা এদেশে প্রচলিত হয়। পরে হিন্দুগণের নিকটও ইহা ক্রমে আদরণীয় হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষে নারীজাতির অবস্থা এইরূপে ক্রমে হীন হইয়া অনুমান ১০০০ খৃষ্টাব্দে পুরুষের নিকট নারীর অধীনতা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও পুরোহিত-প্রাধান্যই এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। পুরোহিতগণ আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিম্ন জাতি ও স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতনারীর অবনতির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল মুসলমান-বিজয় তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে। এই মুসলমান-শাসনকালে কঠোর অবরোধ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া নারীজাতির সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে নারীর কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই। নারীগণ চিরজীবন পরাধীন থাকিবেন এবং কিছুতেই আপনার প্রভু হইতে পারিবেন না—হিন্দুশাস্ত্রের ইহা একটা প্রধান শিক্ষা। প্রথমে তিনি পিতার অধীন, তৎপর স্বামীর অধীন,—বিবাহকালে স্বামীর হস্তে তাঁহাকে "দান" করা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরেও তিনি স্বাধীন নহেন, নিজ পুত্রগণের অধীন। এই প্রকার রীতির অনেক দোষ। সে বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে নারীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

আদি নর-নারীর সৃজনমুহূর্ত্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত বিনা উদ্দেশ্যে এজগতে একটী মনুষ্যেরও সৃষ্টি হয় নাই। পুরুষগণের ন্যায় নারীগণও ঈশ্বরের নিকট নিজ নিজ জীবন ও শক্তির জন্য দায়ী, এই সকল শক্তির অপব্যয় করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ভারতনারী যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমার জীবন লইয়া আমি কি করিব ?"—বোধ হয় এদেশের কোন নারীই সন্তোষ

জনক উত্তর দিতে পারেন না। মানুষের চরিত্র, রীতি-নীতি ও শক্তি এক প্রকার নহে, এজন্য এই প্রশ্নের একটী কোন নির্দ্দিষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। কর্ম্মের অনুরাগ ও শক্তি সত্বেও যাহারা তাহা অনুশীলন করে না তাহাদের পক্ষে এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আরও কঠিন। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, গৃহই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র, গৃহের বাহিরে তাঁহার কোন কার্য্য নাই। কেহ কেহ বলেন, গৃহের বাহিরেও তাঁহার কর্ত্তব্য আছে;—এই মতাবলম্বীগণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। পণ্ডিতবর রস্কিনের মতাবলম্বী-গণ বলেন, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ মনে করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা, কারণ একে যাহা আছে অপরে তাহা নাই, নারী পুরুষের অনুপূরক—পুরুষের অপূর্ণতা দূর করিবার জন্য নারীর সৃষ্টি। অপর পক্ষ বলেন যে, নারীগণ সর্ব্বাংশে পুরুষের সমান, এই জগতের উন্নতি-সাধনে তাঁহারা পুরুষের সহকর্ম্মী। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, দুহিতা, পত্নী ও মাতারূপে রমণীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ। কন্যা, ভগিনী, বন্ধু, দরিদ্রের সাহায্যকারিণী ও সহানুভূতিকারিণী-রূপে অসংখ্য উপায়ে নারী তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তীদিগের সাহায্য করিতে পারেন। নারীর প্রকৃত নারীত্ব অতি মহৎ, ভদ্র-প্রকৃতি নারীর জীবন অতি উচ্চ। এই 'ভদ্র' কথাটীর মধ্যে অনেক অর্থ নিহিত আছে;—ভদ্র নারী অপরের মত, ইচ্ছা, এমন কি খেয়ালগুলি পর্য্যন্ত উদার ভাবে দেখিবেন, নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকিবেন কিন্তু অন্যের ভ্রান্ত মতামতগুলির প্রতি উপেক্ষা দেখাইবেন না, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন বিষয়ে কখনও অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিবেন না। নারী পরিশ্রমী, সতী, ধৈর্য্যগুণ-সম্পন্না ও স্নেহশীলা হইবেন, তাঁহার প্রকৃতি মধুর হইবে, তাঁহাতে আত্মসম্মান সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিবে। এই সকল মহৎগুণ নারীচরিত্রের বিশেষত্ব। পত্নীরূপে নারীর প্রধান কর্ত্তব্য স্বামীর প্রতি। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল, পুরুষের পরুষ প্রকৃতি তাঁহাতে কমনীয়তায় পরিণত, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর তাঁহাকে জীবনের পথে তাঁহার দৃঢ়তর ও বলিষ্ঠতর সহচরকে সাহায্য করিবার শক্তি দিয়াছেন। পণ্ডিতবর রস্কিন স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—(১) অপরকে সুখী করা, (২) তাহাদিগকে নানা মুখরোচক খাদ্যে পরিতুষ্ট করা, (৩) তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, (৪) তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলায় রাখা ও (৫) শিক্ষা দান করা। কেহ কেহ বলেন এ সকল ত সেকেলে কথা, স্ত্রীলোকের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্য করিবার মত মেধা ও শক্তি আছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া নারীর পক্ষে গৃহকর্ম্মে উপেক্ষা করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। পত্নীকে পতির নিকটতম, প্রিয়তম বন্ধু হইতে হইবে, সুতরাং হৃদয়-মনের শক্তিতে তাঁহার পতির সমকক্ষ হওয়া প্রয়োজন, পতিকে সান্ত্বনা ও পরামর্শ দানের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। স্বামীস্ত্রী যেখানে সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সমকক্ষ সেখানেই পূর্ণ সুখ সম্ভব, কারণ ঘনিষ্ঠ গার্হস্থ্য জীবনে উভয়েই অনিবার্য্যরূপে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু পুরুষের সমকক্ষ হইতে হইলে নারীকে সুশিক্ষিতা ও সুসংস্কৃতা হইতে হইবে। স্বামী কি স্ত্রীর জীবনে কেবল তাঁহার উপযুক্তরূপে সেবা করিবার শক্তি ও নিপুণতাই দেখিতে আশা করেন? তাহা নহে, স্ত্রীর মানসিক শক্তি ও মানসিক রুচিগুণে তাঁহার সংসর্গ স্বামীর নিকট জীবন ও আলোকের উৎস-স্বরূপ হয় ইহাও তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। স্ত্রীর উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা স্বামীর উচ্চতম আদর্শে এবং বিশুদ্ধ, গভীর পতিপ্রেমে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বামীকে এই কর্ম্মব্যস্ত সংসারের মলিনতার ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবে। এই প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলে স্বামীর মনে আর আপনার প্রাধান্যভাব থাকিতে পারে না। কখন্ একে অন্যের বশবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজন তখন উভয়েই তাহা বুঝিতে পারেন। দম্পতির মধ্যে এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, পরবর্ত্তী জীবনে স্বামী যখন নানা ভাবনা চিন্তায় প্রপীড়িত হন তখন স্ত্রী তাঁহার কি উৎকৃষ্ট সহায়! দুঃখে তিনি স্বামীকে সান্ত্বনা দেন, তাঁহার অবসন্ন চিত্তে শক্তি সঞ্চার করেন,

তাঁহার হৃদয়ে নব আশা অনুপ্রাণিত করেন। দ্বিগুণিত শক্তি ও উৎসাহ লইয়া স্বামী তখন জীবনের কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। পুরুষের জীবনে নারীর প্রভাবের পরিমাণ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। রস্কিন বলেন, নারীর স্পর্শব্যতীত পুরুষের আত্মার রক্ষা-কবচ কখনও দৃঢ়রূপে তাহার হৃদয়ে সংলগ্ন হয় না। নারী যখন শিথিল-হস্তে তাহা স্পর্শ করেন তখনই পুরুষ স্বীয় পৌরুষ হইতে বিচ্যুত হন। বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স তাঁহার "Professor at the Breakfast Table" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "অনেক সময় দেখিয়াছি, পাল নাই, দাঁড় নাই, বাষ্পশক্তির ক্রিয়া নাই, তথাপি এক একটী জাহাজ প্রবল বেগে, আপনার গৌরবে, নদীস্রোতের প্রতিকূলে চলিয়া যাইতেছে, যেন শত শত অদৃশ্য বলবান্ হস্ত গুণ টানিয়া ইহাকে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু আমি জানি, তাহাদের হালের নিম্নে ক্ষুদ্র এক বাষ্পীয় আকর্ষণতরী অদৃশ্য থাকিয়া জাহাজখানাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এই ক্ষুদ্র বাষ্পীয় তরীখানির কার্য্য স্থগিত হইলে প্রবল স্রোতে জাহাজখানা কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা থাকে না। আমি এরূপ একাধিক প্রতিভাশালী ব্যক্তির বিষয় জানি যাঁহাদের জীবনে তাঁহাদের পত্নীগণই ঐ ক্ষুদ্র অদৃশ্য বাষ্পীয় আকর্ষণতরীর ন্যায় কাজ করিয়াছেন। স্বামীর ছায়ায় ছায়ায় থাকিয়া কঠোর শ্রম ও সুকোমল প্রেমে তাঁহারা আপন আপন স্বামীকে সকল প্রকার বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া সফলতার পথে অগ্রসর করিয়াছেন। পত্নীর সাহায্য না পাইলে এই সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবন হয়ত সংসার সমুদ্রের কোন্ আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া থাকিত।"

এই একই প্রণালীতে মাতাও সন্তানের জীবনে আপনার প্রভাব বিস্তার করেন। মা একাকী শত শিক্ষকের সমান। সন্তানের জীবনে পিতা অপেক্ষাও মাতার প্রভাব বেশী। স্ত্রীর সম্বন্ধে যেমন, মাতার সম্বন্ধেও তেমনি একথা সত্য, যে সুশিক্ষিতা নারীগণই উৎকৃষ্ট মাতা হইতে পারেন; কারণ অপত্য স্নেহ নারীকে শুধু আত্মত্যাগই শিক্ষা দেয় না, ইহা নারীর বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ করে, অনেক সময় সন্তানের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত পরিচালনা প্রয়োজন হয়। শিশুর প্রথম শিক্ষা সম্বন্ধে রস্কিন বলিয়াছেন, "তোমরা কি মনে কর যে গৃহের সুশৃঙ্খলভাব, জনক-জননীর শান্তিপূর্ণ মুখ ও সুমধুর ভাষা, এবং অস্থির ভাবে কঠোর ও অসতর্ক প্রকৃতির একদল লোকের মধ্যে এক কোল হইতে অন্য কোলে ঘোরা ফিরা করা, এই দুয়ের পার্থক্য শিশুর চরিত্রে কোন পার্থক্য ঘটায় না?" মাতাই পরিবারে কোমলতা, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা সংক্রামিত করেন, পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। মাতৃপ্রেম সর্ব্বসহ, সন্তানের জন্য মা সহিতে পারেন না এমন কষ্ট কি আছে? তাঁহার সমগ্র হৃদয় তিনি সন্তানকে অর্পণ করেন, তিনি সন্তানে তন্ময় হইয়া যান! সময় এই প্রেম ম্লান করিতে পারে না। জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বয়সে তাঁহারই প্রেম সন্তানের প্রাণে সুখস্মৃতি আনিয়া দেয়; তাঁহারই প্রেম গৃহকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করে; গৃহের ঐ শান্ত স্নিগ্ধ আলোক জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পথভ্রান্ত সন্তানকে নিকটে আহ্বান করে। মাতৃচরিত্রের প্রভাব ব্যতীত সেক্‌স্‌পিয়র, বেকন, গেটে প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ কি সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন? আমাদের আপন গৌরব ঘোষণার জন্য নয়, কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহিত হইবার জন্য আমরা বলিতে পারি "মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর মধ্যে দেশের ভবিষ্যদ্বংশ নিহিত।" সদগুণ-সম্পন্না নারীর স্মৃতি মৃত্যুর পরেও তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে ও তাঁহার প্রসূত ও পালিত সন্তানের জীবনে বিদ্যমান থাকে।

"The rights of women, what are they?
The right to labour and to pray,
The right to comfort in distress,
The right when others blame to bless."

* * * *

খাটিবে পরের তরে শান্তি দিবে দুঃখে শোকে,
মাগিবে মঙ্গল-বর আর।

অন্যে শাপ দিবে যারে আশীষ করিবে তারে
রমণীর এই অধিকার।

"There's not a place in earth or heaven,
There's not a task to mankind given,
There's not a blessing or a woe,
There's not a whispered yes or no,
There's not a life, or death or birth
That has a feather's weight of worth
Withont a woman in it."

স্বর্গ বা পৃথিবী 'পরে হেন স্থান নাই,
মানুষের হেন কর্ম্ম দেখিতে না পাই,
দুঃখ বা সম্পদ, কোন উচ্চারিত বাণী,—
জন্ম বা মরণ, কিংবা হেন কোন প্রাণী,
কিছু নাই, কিছু নাই, বিশাল সংসারে,
শক্তিরূপে নারী নাই যাহার মাঝারে।

সকল নারীই এই আদর্শের অনুরূপ না হইতে পারেন, কিন্তু আদর্শের অনুসরণ সকলেরই সাধ্যায়ত্ব। নারী যদি সাধ্বী, কোমলপ্রাণা, প্রেমিকা ও ধৈর্য্যশীলা হন, তবে জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, তিনি তাঁহার চারি দিকে এমন কতকগুলি প্রভাব বিস্তার করেন যাহা তাঁহার জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করে। কবিবর টেনিসন তাঁহার Princess নামক কাব্যগ্রন্থে, নারী পুরুষের অনুপূরক এই মতটা সাধারণের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিবাহ ও গৃহকার্য্যেই নারীর কর্ত্তব্যের অবসান হয়, টেনিসনের এরূপ মত নয়। স্থানে স্থানে অবশ্য এরূপ ভাবও আছে। নারীকে গৃহে প্রকৃত নারী হইতে হইবে, দেশ ও জনসমাজের জন্য প্রকৃত নরনারী প্রস্তুত করিতে হইবে। স্থানে স্থানে আবার উচ্চতর মতটীও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞান পুরুষের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, নারীর পক্ষেও তেমনি প্রয়োজনীয়, কিন্তু নারীর নারীত্বের বিকাশের পক্ষে শিক্ষার প্রণালী যেন অন্তরায় না হয়। তিনি বলিয়াছেন,—কি মন্ত্রণায়, কি বিশ্রম্ভালাপে, সংসারের জটিল কর্ম্মে, কি স্বার্থত্যাগে অথবা প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের গভীর তত্বানুসন্ধানে, সর্ব্বত্রই দুটী মাথা অর্থাৎ নরনারী উভয়েরই প্রয়োজন।

দার্শনিক প্রবর অগষ্ট কোম্‌ট ও পণ্ডিতবর রস্কিনের মত একত্র করিলে আমরা নারীর কর্ত্তব্যের একটা পূর্ণ আদর্শ পাই। কোম্‌ট বলেন, বিষয়কর্ম্মে দক্ষতা ও তৎসংসৃষ্ট মানসিক শক্তিতে পুরুষ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপর পক্ষে নারীর শক্তি ভাব-রাজ্যে। প্রেমে নারী শ্রেষ্ঠ, শক্তিতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে রস্কিন বলেন, পরিবারের ভরণপোষণ, উন্নতি ও রক্ষা পুরুষের কর্ত্তব্য, গৃহের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যবিধান এবং পরিবারে সুখ-শান্তি স্থাপন নারীর কর্ত্তব্য। কিন্তু উভয়েরই গৃহের বাহিরে,—দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আছে। দেশে অর্থাগম, দেশ-রক্ষা ও দেশের উন্নতি-সাধন পুরুষের কর্ত্তব্য। রাজ্যের সুখ-শান্তি বিধান ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন নারীর কর্ত্তব্য।

কিন্তু 'নরনারী উভয়ের সমান অধিকার' এই মতটা দিন-দিন প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এখন আমরা এই মত সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই মতাবলম্বীগণ বলেন, পুরুষও স্ত্রীলোক সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের সমান, সুতরাং পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোককেও তাঁহার সকল প্রকার শক্তির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। একজন লেখক বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকের আত্মা ও পুরুষের আত্মায় যেমন স্ত্রী-পুংভেদ নাই, সংসারে দক্ষতালাভের শক্তিতেও তেমনি উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।" Ariosto বলেন, "স্ত্রীলোক যখন যে বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন সেই বিষয়েই যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।" উপযুক্তরূপ চেষ্টা করিলে নারীদিগের বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির যে সবিশেষ উন্নতি হইতে পারে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কেবল ব্যাকুল আগ্রহ ও সুশিক্ষার প্রয়োজন। সাহিত্য-জগতে নারীর কৃতিত্বের আলোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে মানসিক শক্তিতে নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন নহেন। যত বেশী সুযোগ দেওয়া হইয়াছে নারীর উন্নতিও তত

অধিক হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দেখা গিয়াছে, যে নারীর মস্তিষ্কের গঠন অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্কের গঠন অধিকতর জটিলতাময় ও শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু সাধারণ একজন পুরুষ অপেক্ষা সাধারণ এক জন স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প, কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ মনে হয় না। উভয়ের পক্ষেই হৃদয়, মন ও আত্মার উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা আবশ্যক, সময়ের সদ্ব্যবহার ও অনন্ত জীবনের উপযোগী সাধনার প্রয়োজন। একজন চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন, "পুরুষের ন্যায় নারীরও দেহ-মন-আত্মার বিকাশের প্রয়োজন,—শারীরিক বিকাশ দ্বারা পুরুষ অপেক্ষা তাঁহার দৈহিক শক্তি অল্প হইতে পারে, কিন্তু কমনীয়তা ও সৌন্দর্য্য অধিক হইবে, মানসিক বিকাশ দ্বারা তাঁহার মনোনিবেশ ও বিচারশক্তি পুরুষের সমান না হইলেও তাঁহার রুচি পুরুষের রুচি অপেক্ষা সুমার্জ্জিত ও অনুভূতি অধিকতর তীক্ষ্ণ হইবে। নৈতিক বিকাশ দ্বারা নারী দৃঢ়তা, উদ্যম ও কর্ম্মশীলতা বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ না হইতে পারেন, কিন্তু দয়া, নম্রতা ও ধৈর্য্য-শক্তিতে তিনি পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেন।" সমাজ-সংস্কারাদি বিষয়েও নারী পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন, কারণ সাহস কেবল পুরুষোচিত গুণ নহে, স্ত্রীলোকও যথেষ্ট সাহসের অধিকারিণী। স্ত্রীলোকও আশ্চর্য্য সাহস দেখাইতে পারেন। এই সাহসবলে দুঃখের তীব্রতম যাতনা তিনি নীরবে সহ্য করিতে পারেন, অপরের কল্যাণের জন্য আপনাকে বলি দিতে পারেন, অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে ও অকারণ-নিন্দা শান্ত চিত্তে সহিতে পারেন। একজন পুরুষ লেখকই লিখিয়াছেন, "পুরুষের সাহস রীতি, শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল, নারীর সাহস প্রাণের গভীর ভাব ও উচ্চ উদ্দেশ্য হইতে উৎপন্ন হয়।" কিন্তু নারীর শক্তিবিষয়ক এই প্রকার মত অল্প দিন হইল প্রচলিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পুরুষদিগের ধারণা ছিল, যে স্ত্রী-পুরুষের শক্তিতে অনেক পার্থক্য। তাঁহারা বলিতেন, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাঁহার শক্তি পুরুষের শক্তির সমান নয়। কিন্তু দিন দিন এই সকল ধারণা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু একথা সত্য, যে বর্ত্তমান সময়ে নারীগণ পুরুষের ন্যায় কর্ম্মদক্ষা নহেন, কারণ অতি অল্প স্ত্রীলোকেই বিষয়-কার্য্যের অনুশীলন করিয়াছেন। এবিষয়ে নারীদিগের অভিযোগ এই যে পুরুষের ন্যায় তাঁহাদের বিষয়-কর্ম্ম করিবার সুযোগ ঘটে না। সে যাহা হউক, তাঁহাদিগকে অধ্যবসায় ও কঠোর কর্ম্মশীলতার পরিচয় দিতে হইবে। তাঁহারা স্ত্রীলোক বলিয়া জীবন-যাত্রা তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে এরূপ মনে করিলে চলিবে না। সম্পাদনীয় বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ ও সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি সদগুণের অধিকারিণী না হইলে বিষয়-কর্ম্মে নারীগণ সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না। বিশেষ ভাবে আমাদিগকে স্ত্রীজন-সুলভ ভাব-প্রবণতা বর্জ্জন করিতে হইবে।

পূর্ব্বে লোকের মনে একটা সংস্কার ছিল, যে উচ্চশিক্ষা নারীদিগকে স্ত্রীজনোচিত সদ্গুণসমূহে বঞ্চিত করে; সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সময় আমাদিগকে এই অভিযোগ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। সময় সময় আমাদিগকে কোন কোন শিক্ষিতা নারীর অপরূপ ব্যবহার দেখিয়া নিতান্তই লজ্জিত হইতে হয়। তাঁহারা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন যে উচ্চশিক্ষা লাভ করাতে তাঁহারা নারীজীবনের কতকগুলি সাধারণ কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ভাবেন, মস্ত একটা কি-জানি-কি হইয়া পড়িয়াছেন; সামান্য গৃহকর্ম্ম আবার করিতে হইবে কেন? এইরূপ অহঙ্কার শিক্ষার লক্ষণ নহে। সুশিক্ষিত নরনারী কোন নির্দ্দোষ কার্য্যে অবহেলা করেন না। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন কর্ত্তব্যই হীন বা ক্ষুদ্র নহে; প্রত্যেক সামান্য কর্ত্তব্য আমাদিগকে মহত্বের পথেই লইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

সরমা।

রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী অয়ি সরমা সুন্দরি!
স্বর্ণ-মরু-লঙ্কা মাঝে মন্দাকিনী করি'
তোমা কি সৃজিলা স্রষ্টা জানকীর লাগি'?
যম-দূতী চেড়ীবৃন্দ নিশিদিন জাগি'
সুতীব্র কটাক্ষে আর রূক্ষ শ্লেষ-ভাষে,
রাঘব-হৃদয়েশ্বরী বৈদেহীর পাশে
যে বহ্নি রাখিত জ্বালি'—অশোক-কানন
পরিণত করি শোক-শ্মশানে ভীষণ,—
সারা বক্ষ পাতি' তায় হে দেবি সরমা,
তুমিগো করিতে রক্ষা সে চারু প্রতিমা
সবার অলক্ষ্যে রহি'! তব ও হৃদির
অজস্র ভকতি-প্রীতি নির্ম্মল গভীর
নিঃশব্দে উঠিত জাগি' করুণ-নয়নে—
ভকতের অর্ঘ্য যথা আরাধ্য-চরণে!
তোমার প্রত্যেক বাক্য আশা ও আশ্বাসে
কি সান্ত্বনা, কিবা শান্তি, সে শক্র-আবাসে
প্রদানিত দগ্ধপ্রাণে রাজর্ষি-বালার!
পুত্র-হন্তা-জায়া প্রতি হেন ব্যবহার
কে করেছে বিশ্বে আর?—অতুল্যা ভুবনে
ধন্য তুমি হে সরমা, পৌলস্ত-ললনে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আদর্শ দাম্পত্য-জীবন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—একাকিনী।

বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া একাকিনী আসিয়া কত কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে দেশের বাটীতে পড়িয়া ছিলে। তার পর এত কষ্টের পুরস্কার স্বরূপ একটু সুখের দিন দেখিয়াছিলে। হরিনাভিতে আমার সঙ্গে ও ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আমি মতিহারী চলিলাম, তোমাকে আবার আমার সঙ্গ-ছাড়া হইতে হইল। এবারকার পরীক্ষা আরও সুদীর্ঘ; এক বৎসর কাল একাকিত্বে কাটিয়া গেল। দেবি, এ এক বৎসর তুমি যে কষ্টে কাটাইয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া এখনও চক্ষে জল আসে। অথবা এই সময় হইতে তোমার ও আমার আত্মা পরীক্ষার অনলে শুদ্ধ হইতে চলিল। তুমি এ সময়ে নিজেও তোমার পত্রে তাহা স্বীকার করিয়াছ। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম যে কয়েক দিন পরই আমি তোমাকে মতিহারী লইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু সেখানকার কাযটা দুর্ভিক্ষের কায; স্থায়ী হয় কি না কিছু স্থির ছিল না; তাই তোমাকে লইয়া যাওয়া হইল না। তোমাকে দেশের বাটীতে পাঠাইয়া দিবার কথা হইল। সেজদাদাই তখন বাড়ীর কর্ত্তা। তাঁহার কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তুমি কলিকাতার বাসায় দুদিন রহিলে; কারণ পল্লী-গ্রামে চলিয়া গেলে আর শীঘ্র আসা হইবে না; আমার কাছে যাইবার যে ক্ষীণ আশাটুকু, তাহা তখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। কিন্তু সে দুদিন ফুরাইয়া গেল, তারপর ভবানীপুরে তোমার পিসামহাশয়ের বাটীতে গিয়া কিছুদিন থাকিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলে। বিরক্তি মিশ্রিত সম্মতি পাইলে। পিসামহাশয়ের বাটীতে গিয়াও কিছুকাল ছিলে, কিন্তু অবশেষে সেই দেশের বাটীতেই যাইতে হইল।

দেবি, এ সময়ে তুমি যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলে তাহা পড়িয়া মন এখনও কাতর হইয়া উঠে। ৫ই এপ্রিল, ১৮৭৪, লিখিয়াছিলে—"তোমার পত্র পাইলাম। তুমি কোথায়! আমাকে ফেলে তুমি কোথায় গেলে? আমি যে অন্ধকার দেখ্‌ছি। আমার আর কেহ নাই। তুমি কই?"—এইরূপ কাতরোক্তিতেই পত্রখানি পরিপূর্ণ। তোমার মন তখন এমন একাকী হইয়া পড়িয়াছে যে পত্রে প্রবোধ মানিত না। আমার পত্রগুলি পাঠ করিয়া দর্শনের পিপাসা আরও বাড়িয়া যাইত! আগুনে ঘৃত ঢালিলে কি তাহা নির্ব্বাণ হয়? তখন তো তুমি কেবল শরীরই জানিতে আত্মাকে তখনও চিনিতে শেখ নাই। তোমার দোষ ছিল না। এ সেবকই তখনও শরীরের জন্য ব্যস্ত ছিল। তুমি তো কিছু উচ্চ শিক্ষা পাও নাই।

আমার নিজেরও তখন ধর্ম্মবল কিছু ছিল না। বিদেশে ধর্ম্মবন্ধুহীন হইয়া আমিও অন্ধকারে বেড়াইতেছিলাম। ঐ পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, "সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ডাকিও, যেন একটুও ভুলিও না।" আমার সেই অবস্থায় তোমার এরূপ এক একটা কথা আমার কত যে উপকার করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আবার জিজ্ঞাসা করিলে, "মতিহারী জায়গা কেমন, বন্ধু কেমন? সমাজ আছে কিনা? ধর্ম্মবন্ধু আছে কিনা? তোমাকে শিবনাথ বাবুর মত কেহ স্নেহ করিবার লোক আছেন কিনা, শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। তোমার যে কষ্ট হইবে সমুদায় আমাকে দিও; আমি তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব।" এমন করিয়া আমার মনের সকল ভারের অংশ না লইলে, আমার আত্মার কল্যাণের সংবাদ না লইলে সে সময় আমি কোথায় থাকিতাম? দেখি, তখন তুমিও অনেক নিম্নভূমিতে ছিলে, আমিও অনেক নীচে ছিলাম। শরীরের বিচ্ছেদে উভয়েই কাতর হইতেছিলাম। কিন্তু ভগবান দেখাইলেন যে পরস্পরের ভালবাসা ও সহানুভূতির গুণে দুটী নিম্নস্তরবাসী আত্মাও পরস্পরের কত সাহায্য করিতে পারে।

শ্রীপুরের বাটী গিয়া তোমার সেই পুরাতন জীবন আবার আরম্ভ হইল। প্রতিদিন সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, দুটি কন্যা পালন, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে অবসর পাইলে নিজেও একটু পড়া ও আমাকে পত্র লেখা এই তোমার দৈনিক জীবন ছিল। এ সময় ধানভানার দিন পড়িল, তাহাতে অত্যন্ত অধিক সময় যাইত, ও পরিশ্রম হইত। কতদিন এমন হইয়াছে যে আমার পত্র আসিয়াছে, তখন ধান ভানিবার ঘরে কাযে ব্যস্ত রহিয়াছ, পত্র পাঠের ঔৎসুক্যে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, কিন্তু পত্র পড়িতে পাও নাই; সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া তবে পত্রের দিকে মন দিয়াছ। কত কষ্ট ও অসুবিধা ছিল, তবুও পত্র লিখিতে ছাড়িতে না। প্রায়ই তিন চারি পৃষ্ঠার পত্র আসিত।

তোমার মনের কষ্টের আর একটি কারণ হইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তোমাকে শ্বশুরালয়ে আনা হইত, আবার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই কিম্বা শ্বশুরালয়ে থাকিবার অসুবিধা হইলেই, বাপের বাটী পাঠান হইত। একবার এইরূপে পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলে; হঠাৎ শ্বশুরালয়ে আসিবার আদেশ হইল। তখন তোমার পিত্রালয়ে কেবল তোমার মাতা ও দাদা ছিলেন; সেদিন একাদশী, মাতাকে একা ফেলিয়া আসিতে তোমার কষ্ট হইতে লাগিল। আর তখনও তোমার দাদার আহার হয় নাই; তুমি একবেলা পরে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলে। শ্বশুরালয় হইতে উত্তর আসিল, "না, এখনই আসিতে হইবে।" ইহাতে তোমার মাতা ও তুমি বড় ক্লেশ পাইয়াছিলে। তোমার মাতা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার কন্যা কিম্বা বধূ কাহারও দ্বারা আমার উপকার হয় না।" তোমার মাতার এই কথাটুকুর জন্যও তোমাকে শ্বশুরালয়ে অনেক অপ্রিয় বচন শুনিতে হইয়াছিল।

পরিবারের এইরূপ ব্যবহারে যখন কষ্ট পাইতে, সেই সময়ই আবার আমার ধর্ম্মবন্ধুদের পত্র ও সময়োচিত অর্থসাহায্য পাইয়া তোমার মন বিস্ময়াপন্ন ও কৃতজ্ঞ হইত। বাস্তবিক, তুমি ও আমি সে সময়ে অমন বন্ধু না পাইলে আমাদের জীবন কত দুঃখময় হইত। তুমি এই হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলে যে দুঃখীর কাছে সহানুভূতির মূল্য কত; সেইজন্য নিজেও সেই সহানুভূতি চিরদিন অন্যকে দিয়া আসিয়াছ। * * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—মতিহারীতে প্রথম বার।

মতিহারীতে আমার মাসিক আয় ছিল ৮০ টাকা; তাহা হইতে মাসে ৩০ টাকা দেশে মার নিকটে পাঠাইতে হইত। বাকী ৫০ টাকায় অত বড় সংসার চালান কঠিন; কিন্তু দেখিলাম, তুমি বেশ গুছাইয়া চলিতে লাগিলে। টানাটানি বলিয়া কখনও ক্ষুণ্ণ হও নাই। শেষ মাসে প্রায়ই টাকা হাতে থাকিত না, কিন্তু তুমি একবারও মুখ মলিন করিতে না।

এইবার আমরা ব্রাহ্ম পরিবারের মত জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। ১৮৭৬ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে

নিত্য পারিবারিক উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। নিজ বাটীতেই সমাজ স্থাপন করা হইল। নারীদের সহিত জুটিয়া তুমি সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিতে। সমাজ কাহাকে বলে তাহা বুঝিলে। পরের জন্য চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে। এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে বড় ঝড় হইয়া অনেক লোক মারা যায় ও লোকের অন্নকষ্ট হয়। সেই বিষয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কলিকাতার মন্দিরে হৃদয়ভেদী আবেদন করেন। আমি ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সেই আবেদন মতিহারীর সমাজে ১৮৭৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর সামাজিক উপাসনার পরে পাঠ করি। তুমি আবেদন শুনিবামাত্র তোমার হাতের বাজু দিতে প্রস্তুত হইলে। রাত্রে আমি গৃহে আসিলে তুমি যে কি স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া আমার সঙ্গে কথা বলিলে, তাহা ভুলিবার নয়। তোমার বাপের বাটীর বাজু, আমি দি নাই, তাহা দান করিবার জন্য আমার নিকট বিনয় করিবার প্রয়োজন কি ছিল? এ সময় তুমি বুঝিয়াছিলে, তোমার ও আমার ধনে প্রভেদ নাই। পাছে কোন অন্যায় দান করিয়া ফেল, এই আশঙ্কা। বাজুর দাম সাহায্য ফণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া গেল। আমি দেখিতে লাগিলাম, ও দেখিয়া দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলাম, যে আমার প্রিয় ধর্ম্ম তোমারও জীবনকে অধিকার করিতেছে।

কত ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমি এ সময়ে তোমার চরিত্রের বিকাশ, কার্য্য-দক্ষতার বিকাশ, হৃদয়ের বিকাশ লক্ষ্য করিতাম! এমন করিয়া তুমি ও আমি আর তো কখনও সংসার করি নাই; তাই প্রতিদিন আমাদের দুজনারই কত শিক্ষা লাভ হইতে লাগিল। পিত্রালয়ে থাকিতে তুমি কাপড় সম্বন্ধে খুব পরিপাটী ছিলে। দেশী ধুতি না হইলে তোমার মন উঠিত না। কলিকাতায় আসিবার পর প্রথমে ছোপান সাড়ী, তারপরে বিলাতী ধুতি আনিয়া দিতাম। মতিহারীতে আসিয়া বিলাতী ধুতিও জুটিত না। থান ক্রয় করিয়া তাহাতে নীলের ছোপ দিয়া সাড়ী করিয়া লইতে, এবং সেই অপূর্ব্ব পাড়-যুক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে তোমাকে বড়ই ভাল দেখাইত। এইরূপে বস্ত্রের তারতম্য অগ্রাহ্য করিতে লাগিলে। ইহার পরিণাম এই হইল, যে অবশেষে বেহারের "মুটীয়া," যাহা সে দেশীয় দুঃখীরা ব্যতীত আর কেহই পরে না তাহাই আদরের সহিত পরিধান করিতে। ঐ কাপড় পরিয়া বড় বড় স্থানে যাইতেও কুণ্ঠিত হইতে না। মতিহারীতে তোমার নিজের হাতে টাকা হইল, কিন্তু অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে না। অলঙ্কারের জন্য একদিনও আমাকে বিরক্ত কর নাই। প্রথম প্রথম শাঁখা পরিধান করিতে, শেষে চূড়ী পড়িতে, কিন্তু জীবনের শেষ কয় বৎসর শূন্য হস্তেই থাকিতে। হাতে "নোয়া" না থাকিলে স্বামীর অকল্যাণ হয়, এ কুসংস্কার তোমার ছিল না। কোন শ্রদ্ধেয়া ব্রাহ্মিকার হাতের নোয়া তুমি খোলাইয়াছিলে, এবং ব্রাহ্মিকাদের মধ্যে যিনি "নোয়া" পরিতেন তুমি তাঁহাকে কতই তিরস্কার করিতে!

এই সময় একদিন একটা ফুলকপি পাইয়াছিলে। তখন মতিহারী পর্য্যন্ত রেল হয় নাই; সেদেশে কপি জন্মিত না, অন্যস্থান হইতেও সহজে আসিত না। পাটনা হইতে একজন বন্ধু ঐ ফুলকপি উপহার দিয়াছিলেন। আমি তোমাকে বলিলাম এ কপি সকলকে ভাগ করিয়া দাও। প্রেম যে অল্প বস্তু উপহার দিতে সঙ্কুচিত হয় না, তখনও তুমি তাহা জানিতে না। তাই তুমি প্রথম বলিয়াছিলে, "ছোট কপি, পাঁচ জনার বাড়ীতে দিলে তারাই বা কি খাইবে, আমরাই বা কি খাইব?" অবশেষে সেই কপিটুকু টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া সকলকে বিলাইলে। বুঝিলে যে যেখানে আত্মীয়তা আছে, সেখানে অল্প সামগ্রী উপহার দিলেও সেই আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়। ইহার পর হইতে দেখিতাম, তুমি গৃহের সামান্য সামান্য ভাল বস্তুও সকলকে একটু একটু করিয়া না দিয়া গ্রহণ করিতে না! ক্রমে ক্রমে তোমার দিবার প্রবৃত্তি তোমার ক্ষুদ্র দান শক্তিকে অনেক অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

মতিহারীতে ৫ই মে, ১৮৭৬ তোমার প্রথম পুত্র সুবোধচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। পুত্র সন্তান হইল বলিয়া

আমার মাতার কতই আনন্দ। লক্ষণ সব ভালই বোধ হইতেছিল, তবুও ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছিলাম। মা বলিলেন, আমি সূতিকা-গৃহের নিকটে থাকিলে প্রসূতির যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইবে, এদিকে বাড়ীতে ঘরও বেশী নাই, তাই আমি নিমবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যাকাল। পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিয়া আমার মস্তক কৃতজ্ঞতায় অবনত হইল। কোথায় আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব, তাহা না করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমার দায়িত্ব কত বাড়িয়া গেল! পুত্র সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া, ধর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে বর্দ্ধিত করা, এক দুরূহ ব্যাপার মনে হইতে লাগিল। তোমার অগোচরে একাকী ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রথম দুই সন্তানের জন্মের সময়ে যেরূপ বিঘটন ঘটিয়াছিল, এবার সেরূপ কিছুই ঘটিল না।

আমরা মতিহারী থাকিতেই বন্ধু—বাবুর জীবনে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল; তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, লিভার ফুলিল। অবশেষে ছুটি লইয়া তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইল। তাঁহার নিরাশ্রয়া পত্নী তোমার নিকটে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহাকে তুমি আপনার সহোদরার মত আদরে গ্রহণ করিলে। তোমার বাটীতে তিনটি মাত্র ঘর; তাহার একটি রাম ও বসন্তের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলে। স্থানের টানাটানি সত্ত্বেও আর একটি ঘর ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে। আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ঘর রহিল না। এ অসুবিধাকে তুমি অসুবিধা জ্ঞান করিলে না। শুধু তাহাই নহে; টানা-টানির সংসারে অম্লানবদনে ইঁহাদিগের ভরণ পোষণের সমুদয় ভার নিজ মস্তকে লইলে। যথাসাধ্য 'তন্ মন্ ধন্' দিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলে।

ইহার তিন মাস পরে যখন সেই বন্ধু ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার নবজীবন লাভ হইয়াছে। পূর্ব্বের মত তাঁহাকে দেখিয়া আর ভয় করিত না। একত্রে উপাসনা, একত্রে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। মতিহারীতে যেন একটা নূতন যুগ উপস্থিত হইল। ক্রমে তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন। নগরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমরা এখন ৪।৫ জন ব্রাহ্ম হইলাম। ইহার কিছুকাল পরে শ্রদ্ধেয় সাধু অঘোরনাথ এখানে আসিলেন। কত উপদেশ, কত নাম সঙ্কীর্ত্তন হইল। তিনি পদ্মবনে গিয়া যোগে মগ্ন হইতেন, দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম; আমরা সাধন ভজন কি করি, তিনি সমুদয় জিজ্ঞাসা করিতেন। আমাদের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া এমন করিয়া আর বোধ হয় কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না। পুত্র সুবোধের নামকরণ অনুষ্ঠান তিনিই করিলেন। এই নামকরণ, এবং—বাবুর, তাঁহার স্ত্রীর, তোমার, ও বসন্তের দীক্ষা এবং মতিহারী সমাজের উৎসব একবারে হওয়াতে একটা তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

এই সময় সাধু অঘোরনাথ প্রত্যহ দুইবার স্নান করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্নানান্তে যোগে বসিতেন। তারপর নামগান করিতেন। অতি মিষ্ট লাগিত। আহার করিয়া কত ভাল ভাল কথা কহিতেন। একদিন তাঁহার একজন বন্ধুর বিষয়ে বলিলেন, যে এমনি তাহার দুর্দশা যে পত্নীর নিকটে ভিন্ন তাহার নিদ্রাই হয় না। আরও বলিলেন যে অনাসক্ত না হইলে পরিত্রাণ নাই। যে রাত্রে সাধুর মুখে এই সংবাদ শুনিলাম, সেই রাত্রেই নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ভাবিলাম। আপনার শয্যা সাধুর নিকটে করিতে আদেশ দিলাম। তোমার তাহাতে আপত্তি হইল না। এমনি অভ্যাসের গুণ, দেখিলাম সাধু অকাতরে নিদ্রা গেলেন, কিন্তু আমার নিদ্রা হইল না। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া তোমার ঘরে গেলাম, তবে নিদ্রা হইল। আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিলাম। তোমার সঙ্গে কত পরামর্শই করিলাম! কিসে এ আসক্তি চলিয়া যায় তাহার জন্য কত চেষ্টাই আরম্ভ হইল। এই যে সাধন আরম্ভ হইল, ক্রমে এ পথে গিয়া কত সঙ্কল্প করিতে হইয়াছে ও আবার কত বার পতন হইয়াছে সকলই তুমি অবগত আছ। তোমার সহায়তা ভিন্ন আমি এ দুর্গম পথে একাকী কখনই চলিতেপারিতাম না।॰ * * * *

মতিহারীর যে বাড়ীতে আমরা ছিলাম, অনেকদিন তাহার সংস্কার হয় নাই বলিয়া অন্য বাড়ীতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। তোমার চরিত্রের আকর্ষণ এই সময় হইতে অনুভূত হইতেছিল। তাই, যখন নূতন বাড়ীতে যাইব ঠিক হইল, অমনি বন্ধু—বাবুও বলিলেন, আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। এ বাড়ীর ভিতরে তিনটী ঘর, বাহিরে একটী ঘর। সকলের অপেক্ষা অধম ঘরটীই তোমার ভাগ্যে পড়িল। সকলে আপনার ঘর পছন্দ করিয়া লইলেন; শেষ যাহা থাকিল তাহাই তোমার রহিল। সে ঘরে বায়ুর গতিবিধি নাই, পাইখানার নিকটবর্ত্তী, তবুও তুমি একদিনও অসুখী হও নাই। এই সময় আবার আমার সেজ দাদা মহাশয় নিরাশ্রয় হইয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাহিরের ঘরটীতে তিনি রহিলেন। বাড়ীটি যেন টলমল করিতে লাগিল। সুখের বিষয় যে তখন প্রতিদিন সকলে একত্র উপাসনা করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইতাম। কিছুদিন পরে আমি পাটনার আবকারী ইন্‌স্পেক্টার পদে বদলী হইলাম। তোমাকে মতিহারীতেই রাখিয়া আমি বাঁকিপুরে চলিয়া গেলাম।

আমার চলিয়া যাইবার পর মতিহারীর উৎসব উপস্থিত হইল। কিন্তু বাড়ীতে আমার দাদা রহিয়াছেন। তাঁহার মত ছিল না যে তুমি উৎসবে যাও। এদিকে উৎসবও অন্য বাড়ীতে (উমাচরণ বাবুর বাড়ীতে) হইবে। তুমি ধর্ম্মের আহ্বানে আর স্থির থাকিতে পারিলে না। কয়েক দিন উৎসবের পর যখন বাড়ী ফিরিয়া গেলে, তখন নিজের বাটীতে নিজেই একঘরে হইলে। তোমার সঙ্গিনী বসন্তও তোমার সঙ্গে একঘরে হইলেন। সকলের আহারাদি হইলে তোমরা দুজনে নিজের অন্ন নিজে প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে। কেবল আমার উৎসাহ, আমার প্রার্থনা এবং সান্ত্বনা তোমাকে উচ্চ করিয়া দিত। তুমিও প্রতিদানে অবহেলা করিতে না। এ মিলনের পূর্ব্বাভাস মাত্র।

ইহার কয়েক দিন পরে মতিহারীর বাসা তুলিয়া দিতে হইল। তোমাকে আবার দেশে যাইতে হইল। দেশে গিয়া সকলই পীড়িত হইলে। বিশেষতঃ সুবোধ রক্তামাশয়ে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তাই অনন্যোপায় হইয়া তোমাদিগকে বাঁকিপুরে আনিলাম।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজ ও যুবরাজ-মহিষী—আমাদের সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের একমাত্র পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ও তাঁহার পত্নী ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইনি আমাদের ভাবী সম্রাট। এক সময়ে যে বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার শাসনাধীন হইবে স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করাই এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটও রাজ্যলাভ করিবার পূর্ব্বে এক বার এদেশে আসিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় এই যে যুবরাজের পক্ষে প্রকৃত প্রজাসাধারণের সংস্পর্শে আসিবার কোন সুযোগই হয় না, সরকারী কর্ম্মচারীদের মুখে তিনি দেশের সংবাদ শোনেন, সরকারের অনুগৃহীত ধনী রাজরাজড়াদের দ্বারা তিনি অভ্যর্থিত হন, তদ্দ্বারা দেশের সুখ সমৃদ্ধির একটা ধারণা করেন। দেশের প্রকৃত অবস্থা—জনসাধারণের দুঃখদৈন্য—সমস্তে তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়। সুতরাং এই প্রকার ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়। তবে রাজশক্তির প্রতি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের মনে একটা অমানুষিক শ্রদ্ধার ভাব নিহিত আছে। বিশেষতঃ এদেশের লোকের নিকট রাজা দেবতার সমান। সুতরাং যুবরাজও যুবরাজ-মহিষীর আগমনের দ্বারা ভারতবাসীর রাজভক্তি কিয়ৎ-পরিমাণে চরিতার্থ হইবে। বোম্বাইবাসীগণ কাজের লোক, রাজভক্তিও দেখাইয়াছেন, এবং এই উপলক্ষে বোম্বাই নগরীর একটী মহৎ উপকারও সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা এই উপলক্ষে বোম্বাইয়ে এক প্রকাণ্ড মিউজিয়ম (যাদুঘর) স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন। যুবরাজ এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতায় কিন্তু বাজি-পোড়ান ও আমোদ প্রমোদেই সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হইবে।

যুবরাজ-মহিষীর অভ্যর্থনা—বোম্বাইয়ের মহিলাগণ ভাবী সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন, হিন্দু, মুসলমান ও পারসী-মহিলাগণ স্বীয় স্বীয় প্রাচীন প্রথা অনুসারে ধান্য, দূর্ব্বা ও হংস-ডিম্বাদি দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তৎপর মহিলাগণের অভিনন্দন পঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায়ও সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুর-মহিলাগণ যুবরাজ-পত্নীকে অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু বোম্বাই নগরীর মহিলাগণ স্বাধীন ভাবে, স্বেচ্ছায় অভিনন্দনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আর কলিকাতায় ছোটলাটের চেষ্টায়, তাঁহার বাড়ীতে, তাঁহারই প্ররোচনায় এই অভ্যর্থনার আয়োজন হইতেছে।

রুশিয়ায় রাষ্ট্র-বিপ্লব—ইউরোপে রুশজাতি অর্দ্ধ-সভ্য বলিয়া পরিগণিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী প্রভৃতি সভ্য দেশের ন্যায় সে দেশের রাজ্য-শাসনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত নাই; সম্রাট যথেচ্ছাচারী, অভিজাতকুলের পরামর্শ অনুসারে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত রাজ্য তিনি স্বয়ং শাসন করিয়া থাকেন। প্রজার কল্যাণেই যে রাজ্যের কল্যাণ, অর্দ্ধসভ্য রুশসম্রাট এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। উৎপীড়িত, হীন-বল, অশিক্ষিত প্রজা সাধারণও এতদিন সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সভ্যতা ও উন্নতির উজ্জ্বল কিরণ বিস্ফুরিত হইয়া পড়িয়াছে, রাজশক্তির পার্থিব আবরণ সেই স্বর্গীয় জ্যোতির পথ আর অবরোধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। রুশদেশে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। কোটী কোটী প্রজা বিদ্রোহী হইয়া রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই ব্যবসা-বাণিজ্য, রেলওয়ে, টেলিগ্রাম, স্কুল-কলেজ, কল-কারখানার কার্য্য স্থগিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন হত হইতেছে। ফরাসী বিপ্লবের পর এমন রাষ্ট্রবিপ্লব আর দেখা যায় নাই। সম্রাট প্রজাগণকে অনেকগুলি অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু প্রজাসাধারণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতেছে না। তিনি প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পলায়নের সকল আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। পার্থিব শক্তিবলে অন্ধ হইয়া লোকে যখনই মানবের স্বাভাবিক অধিকার অপহরণ করে তখনই এই প্রকার রক্তস্রোতে পৃথিবী-বক্ষঃ প্লাবিত হয়।

রুশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবে শিক্ষিতা মহিলাগণ—রুশিয়া দেশে মহিলাগণ সর্ব্বদাই রাজনীতি-ক্ষেত্রে আপনাদের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সে দেশের প্রজা-সাধারণের অবস্থা সাধারণতঃ যেরূপ হীন, মহিলাগণের সাহায্য না পাইলে দেশের দুর্দ্দশামোচনের দিন আরো সুদূর পরাহত হইত। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন স্ত্রীলোকগণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না, রাজ্যে আগুন লাগিলে বসিয়া থাকাটাও স্বাভাবিক নহে। দেশের লোকের অন্তরে স্বাধীনতার ভাব ফুটাইবার জন্য রুশিয়ার শিক্ষিতা মহিলাগণ ও ছাত্রীগণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণী ছাত্রীগণ পর্য্যন্ত দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কৃষকদিগকে বুঝাইতেছেন যে রাষ্ট্রবিপ্লব না ঘটিলে তাহাদের দুর্দ্দশামোচনের আর উপায়ান্তর নাই। রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁহারা নানা প্রকার পুস্তকাদি বিতরণ করিতেছেন। প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনেও তাঁহারা রীতিমত যোগ দিয়া থাকেন। অনেকে এই জন্য নানারূপ শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। স্বদেশের কল্যাণের জন্য দেশহিতৈষিণী রুশমহিলাগণ দুর্দ্দান্ত অসভ্য "কশাক" সৈন্যের কঠিন বেত্রাঘাত সহিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না, কত ছাত্রী যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অভিজাত মহিলাগণের মধ্যেও অনেকেই উন্নতিশীল দলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

স্বদেশী আন্দোলন—বিলাতের 'ডেইলি ক্রনিকল্' নামক সুবিখ্যাত পত্রিকায় নিম্নলিখিত চিন্তাপূর্ণ কথাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।—বঙ্গদেশ বর্ত্তমান সময়ে নবজন্মগ্রহণের কঠোর প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সমগ্র ইউরোপে জাতীয় জীবনের যে প্রবল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতেছে—যাহার প্রভাবে বিনা যুদ্ধে নরওয়ে দেশ সুইডেন হইতে

স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে—সেই প্রবাহ অতি অল্প পরিমাণেই এশিয়াকে স্পর্শ করিয়াছে। সুদূর পূর্ব্বে—জাপানে—অবশ্যই নবজীবনের উচ্ছ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাইতেছে; চীনও আত্মসম্মান রক্ষার চেষ্টায় এবার সফল হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বক্তৃতামঞ্চে যদিও জাতীয় জীবন পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান তথাপি প্রকৃতপক্ষে সে দেশে জাতীয় জীবন নিতান্তই কল্পনায় বদ্ধ। নানা কারণে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল হইতে বৈদেশিক আক্রমণে উৎপীড়িত হইতেছে। জাতীয় জীবন বিকাশের পূর্ব্বে সকল দেশেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এবিষয়ে ইউরোপের রাজ্য সমূহের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষেও সকল বৈদেশিক আক্রমণকারীর শেষে এমন একজন জেতার প্রয়োজন ছিল, যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জেতা অপেক্ষা বলবান হইবেন এবং বিজিত জাতির মতামত ও রুচিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবেন। এই ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞা অতি অপূর্ব্ব ফল প্রসব করে। লর্ড কার্জ্জন এই প্রকার অবজ্ঞার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। আঘাতের পর আঘাত, অঙ্কুশের পর অঙ্কুশের প্রহারে লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালী জাতিকে অতিমাত্রায় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া শান্ত, বশ্যভাবাপন্ন বাঙ্গালীর অন্তরে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অতি প্রবল অপ্রীতি জন্মাইয়া দিয়াছেন। এমন নিরীহ বাঙ্গালীজাতি গবর্ণমেণ্টের প্রতি এত তীব্র বিরক্তির ভাব পোষণ করিতে পারে, পূর্ব্বে কেহ তাহা সম্ভবপরই মনে করে নাই।

অবশ্য বাঙ্গালী জাতি অস্ত্র গ্রহণ করিবে এরূপ আশঙ্কা কেহ করে না। একদল অশ্বারোহী সৈন্য বোধ হয় বাংলা দেশকে অনন্তকাল আয়ত্তাধীন রাখিতে পারে। অল্প শিক্ষিত ও অশিষ্ট-প্রকৃতি এংলো ইণ্ডিয়ানগণ অপরিণামদর্শীর ন্যায় প্রধানতঃ এই কারণেই বাঙ্গালীকে অবজ্ঞা করিতে সাহসী হয়। যদি আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বাস করিতাম, তবে আর ভাবনার কথা ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অস্ত্রবলই মানবসমাজে সর্ব্বপ্রধান বল নহে। পূর্ব্বকালে শতবৎসর-ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে যাহা না হইত, এখন এক পুরুষেই অদৃশ্য নীরব শক্তির সাহায্যে সেরূপ বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে।

লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে এবিষয়ে বঙ্গদেশের শিক্ষানবিশি অতি দ্রুত ও তীব্র ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। দেশীয়দিগের প্রবলতম প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আইনের পর আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু এতদিন বাঙ্গালীগণ বক্তৃতা ও চীৎকারেই তাহাদের ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছে। অবশেষে এই প্রকার বক্তৃতার অসারতা নিতান্ত নির্দ্দয়রূপেই তাহাদের বোধগম্য হইয়াছে। শত শত প্রকাশ্য সভায় বাঙ্গালী প্রথমে তাহাদের বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছে, অবশেষে কঠোর অবিচারে মর্ম্মাহত হইয়া সকলে নীরবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—এই অবিচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ইংরেজজাতিকে বাধ্য করিবে।

যেন দৈব অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা ইংরাজ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের একটী অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। সাধ্যানুসরে তাহারা ম্যাঞ্চেষ্টারের দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। এই সংকল্প দাবানলের ন্যায় সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গে এই প্রথমবার দেশের ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলে সমভাবে সোৎসাহে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছে।

জাতীয় একতার এই নূতন অনুভূতি অন্তরে লইয়া বাঙ্গালী এই প্রথম জাতীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হয়ত এই চেষ্টার কোন স্থায়ী ফল দেখা যাইবে না। ভারতবাসীর পথে বিঘ্ন অনেক। তাহাদের রাশীকৃত বস্ত্রের প্রয়োজন, বস্ত্র না হইলে তাহাদের চলে না। ম্যাঞ্চেষ্টার ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পে সকল প্রতিদ্বন্দীকে, বিশেষভাবে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতবাসী বস্ত্রবয়ন এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা যত কঠিন হইবে ফল তত অধিক মূল্যবান হইবে; শিশুর প্রথম শিক্ষার ন্যায় ইহাও দীর্ঘ পথ-যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

—

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

...AL LIBR... 6 APR 190..

23 MAY 1906

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

১ম ভাগ। } পৌষ, ১৩১২। { ৫ম সংখ্যা।

ক্যাথেরিন টেইট।

বিশ্বরাজের এই সংসার-উদ্যানে সময় সময় এক একটী অতি অপূর্ব্ব কুসুম প্রস্ফুটিত হয়। কুসুমিত উদ্যানের সহস্র সহস্র পুষ্পকে নিষ্প্রভ করিয়া ইহাদের কোমল-মধুর সৌন্দর্য্য ও প্রাণমনোমুগ্ধকারী সুগন্ধ মানবের চিত্ত আকর্ষণ করে। যতদিন ফুটন্ত থাকে, চারিদিকে শোভা ও আনন্দ বিতরণ করে, যখন ঝরিয়া পড়ে, সৌন্দর্য্যের স্মৃতিটুকু দর্শকের চিত্তে রাখিয়া যায়; সুগন্ধটুকু ছড়াইয়া চারিদিক আমোদিত করে। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা আজ এইরূপ একটী রমণীকুসুমের জীবন-কাহিনী উপহার দিতেছি। ইঁহার নাম ক্যাথেরিন টেইট।

ক্যাথেরিন স্পুনার নামক একজন সম্ভ্রান্ত ধর্ম্ম-যাজকের কন্যা। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ক্যাথেরিনের জন্ম হয়। বাল্যকালেই ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অমায়িক প্রকৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রস্ফুটিত ফুলের মত তাঁহার সুন্দর মুখখানিতে তীক্ষ্ণ প্রতিভার আভা যেন ফুটিয়া বাহির হইত। যে দেখিত সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল তেজস্বী প্রকৃতি, কর্ম্মশীল স্বভাব ও সকল সৎকার্য্যে উৎসাহ পিতামাতার গৃহকে সর্ব্বদা আনন্দে ও জীবন্তভাবে পূর্ণ রাখিত।

বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, তাঁহার সদ্‌গুণরাশিও ততই বিকশিত হইতে লাগিল। ষোড়শী ক্যাথেরিনের চরিত্রের দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য, চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। তরুণ বয়সে মানুষের প্রকৃতি সাধারণতঃ তরল থাকে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে উৎসাহ ও উদ্যমের প্রাচুর্য্যের অভাব না থাকিলেও কোন প্রকার লঘুভাব কেহ কখনও দেখিতে পাইত না। এই বয়সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। একটী মূহুর্ত্তও তিনি অপব্যয় করিতেন না। নিয়মিত গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া পাড়ার প্রতিবাসীদিগকে দেখিতে যাইতেন, বাড়ীর দাসদাসীদিগকে লেখা পড়া শিখাইতেন। প্রতিদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া বাইবেলহস্তে তাঁহার

জননীর শয়নগৃহে উপস্থিত হইতেন এবং জননীর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বসিয়া বাইবেলের কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তৎপর পিতার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতেন। পিতাপুত্রীর এই ভ্রমণ সময়টুকু অতি আনন্দে কাটিত। ক্যাথেরিন পিতার প্রিয় কবিতা স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতেন, পিতা দেবীপ্রতিমা দুহিতার বীণাকণ্ঠের আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে পরমানন্দে প্রভাত-প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ইতিহাস ও সাধুদিগের রচিত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন।

সকলেই জানেন আমাদের দেশের ন্যায় ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্ত্রী-পুরুষের মেশামিশি দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। সর্ব্বগুণান্বিতা তরুণী ক্যাথেরিনের বন্ধুত্ব লাভের জন্য অনেক যুবকই লালায়িত হইতেন। জিব্রাল্টারের বিসপ যাজকপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে ক্যাথেরিনের পিতৃ-গৃহে বাস করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ক্যাথেরিন স্পানচার্চ্চের সকলের হৃদয়মন অধিকার করিয়াছিলেন, ইঙ্গিতে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারিলে আমার ভ্রাতৃগণ ও আমি তাহা পূর্ণ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। তাঁহার মুখের একটু মধুর হাসি অথবা একটা প্রশংসাবাণীর জন্য আমরা করিতে পারিতাম না এমন কাজই ছিল না।" ইংলণ্ডের 'রাগবি" স্কুল একটী অতি সুবিখ্যাত বিদ্যালয়; এই বিদ্যালয়ের প্রথিতনামা প্রধান শিক্ষক সুপণ্ডিত ডাক্তার টেইট প্রতিদিন অপরাহ্নে অশ্বারোহণে ক্যাথেরিনের পিতৃগৃহে আসিতেন ও সায়ংকাল সেখানেই অতিবাহিত করিতেন। বলা বাহুল্য যে দেবীপ্রকৃতি ক্যাথেরিনই তাঁহার এই আকর্ষণের কারণ ছিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই এই দুইটী তরুণবয়স্ক নরনারীর মধ্যে পবিত্র প্রেমের সঞ্চার হইল। মণিকাঞ্চন একত্র মিলিত হইলে যেমন অপূর্ব্ব শোভা হয়, ইঁহাদিগকে একত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনায় ব্যাপৃত দেখিলেও যেন তেমনই সুন্দর দেখাইত। মনে হইত ডাক্তার টেইটের ন্যায় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাশালী ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের জন্যই বুঝি বিধাতা ক্যাথেরিনের মত রমণীরত্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা প্রথম হইতেই পরস্পরকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতেন, অমূল্য সদ্‌গুণাবলীর জন্য পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু ইঁহারা যে পরস্পরের সহিত হৃদয় বিনিময় করিয়া ফেলিয়াছেন, নিজেরাই তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। প্রেমের রাজ্যে অহরহই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা আপনারা না বুঝিলেও আত্মীয় স্বজনেরা বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহাদের মধ্যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। এক দিন ক্যাথেরিন নিবিষ্ট মনে পা-জামা সেলাই করিতেছিলেন, তাঁহার মাতুল দেখিয়া কৌতুক করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কিটি (ক্যাথেরিন), এ গুলি বুঝি ডাক্তার টেইটের জন্য?" কিন্তু ক্যাথেরিন বা টেইট কেহই তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহারা দাম্পত্য-বন্ধনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মাতুল-ভাগিনেয়ীর এই প্রকার ঠাট্টা তামাসা আমাদের দেশে নিতান্তই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইউরোপে নারীর স্বামী-মনোনয়ন প্রথা প্রচলিত, সামাজিক আচার ব্যবহারও বিভিন্ন, সে দেশে এইরূপ ব্যবহার বিন্দুমাত্রও দোষবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে ডাক্তার টেইটের সঙ্গে ক্যাথেরিনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহে পৌরহিত্য করিবার জন্য এই মাতুলকেই তখন নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

বিবাহের পর ক্যাথেরিনের স্কন্ধে গুরু কর্ত্তব্যরাশির ভার পতিত হইল। কোথায় পিতৃভবনের শান্তিময় গৃহসুখ, আর কোথায় ছাত্রাবাসের নানা উদ্বেগ ও দায়িত্ব-পূর্ণ অধ্যক্ষতা কার্য্য। কিন্তু ক্যাথেরিন প্রথম জীবনে শান্তরসাস্পদ পিতৃগৃহে নীরবে যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিলে মানুষ কোন পরীক্ষায় ভীত হয় না, অবশ্য-কর্ত্তব্য কোন কঠিন কার্য্যভার গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় না। পরম আনন্দে, প্রফুল্লচিত্তে তিনি কর্ম্মসাগরে ঝম্প প্রদান

করিলেন। তিনি শুধু এই গুরুভার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না; সহরের প্রত্যেক দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে পরিচয় করিলেন, একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রায় প্রতিদিন তাহাতে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসারে চলিলে মানুষ কত বেশী কাজ করিতে পারে, বিশৃঙ্খল প্রকৃতির লোকে তাহা বুঝিতেই পারে না, তাই জগতের কর্ম্মীদিগের কার্য্যবাহুল্য দেখিয়া আমরা অবাক্ হই। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন তিনি সমবেত উপাসকমণ্ডলীর উপাসনায় যোগ দিবার জন্য ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিতেন। তৎপর কিছুকাল আপনার ঘরে একাকী থাকিয়া পরিবারবর্গের সহিত পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতেন। বেলা দশটার পর গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনে সহরের গরিবেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদের দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিত। ক্যাথেরিন তাহাদের অভাবের কথাগুলি লিখিয়া লইতেন। পরে যথাসাধ্য সেগুলি মোচন করিতেন। অবসর পাইলে স্বগৃহবাসী বন্ধুদিগের সহিত জ্ঞানালোচনা করিতেন ও কথাবার্ত্তা কহিতেন। সুবিধা পাইলেই একটু একটু জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিতেন। অবসর দিনের অপরাহ্নে তিনি বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইয়া স্কুলের ছাত্রদিগের সঙ্গে সায়ংকাল যাপন করিতেন। এই সহৃদয়তাপূর্ণ সান্ধ্যসমাগমে ছাত্রগণের প্রবাস-ক্লেশ অনেক পরিমাণে দূর হইত। দেবপ্রকৃতি শিক্ষক ও স্নেহপ্রবণা শিক্ষকপত্নীর সংসর্গে ছাত্রাবাসও তাহাদের নিকট স্বগৃহ বলিয়া মনে হইত। রাত্রিকালে পারিবারিক উপাসনার পূর্ব্বে ও পরে ক্যাথেরিন অধ্যয়নে নিমগ্ন হইতেন এবং মধ্যরাত্রে শয়ন করিতেন। এত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি স্বামীর জটিলতাপূর্ণ হিসাবপত্র এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতেন যে পরিপক্ক হিসাবনবিশগণ পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন—"ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন বিষয়ে তিনি ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সুশৃঙ্খলা সহকারে প্রত্যেক কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।"

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার টেইট কার্লাইলের ডীন্ নিযুক্ত হন। এখানেও ক্যাথেরিন পূর্ব্বের ন্যায় দরিদ্রসেবা করিতেন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিয়মিতরূপে সময় দিতেন। এইখানেই তিনি গৃহসুখের পরাকাষ্ঠা ভোগ করিয়াছিলেন। আবার এখানেই তিনি জীবনের অন্ধতমসাচ্ছন্ন দিনও দেখিয়াছিলেন। প্রেমপ্রবণ স্বামী ও স্বর্গের ফুলের মত ছয়টী নিষ্কলঙ্ক শিশুসন্তান তাঁহার গৃহকে সদানন্দে পূর্ণ রাখিতেন। মাতৃবক্ষ আনন্দের উচ্ছ্বাসে হিল্লোলিত হইত, ভাদ্রমাসের ভরা গাঙের মত টেইট পরিবার শান্তিসুখে টলমল করিত। কিন্তু বিদ্যুতের হাসির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বজ্রের নিদারুণ প্রহার উপস্থিত হয়, সুখের হিল্লোলের অন্তরালে তেমনই কালের করাল দশন লুক্কায়িত ছিল। ক্যাথেরিনের পূর্ণ গৃহ শূন্য করিয়া, ভরা কোল খালি করিয়া একে একে পাঁচটী পুত্রকন্যা কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যুর দংশনে আহত হইল। সন্তানশোকের নিদারুণ ব্যথা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে বুঝিতে পারে না। চির-সুখী, পিতা মাতার আদরের কন্যা, দেবতার মত স্বামীর হৃদয়ভরা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অধিকারিণী ক্যাথেরিনকে এমন মর্ম্মভেদী শোক সহিতে হইবে কে জানিত? কিন্তু ভগবান্ তাঁহার বিশ্বাসী, ভক্ত পুত্রকন্যার ভাগ্যে সংসারের দুঃখকষ্টের মাত্রাটা চিরদিনই কিছু বেশী করিয়া ব্যবস্থা করেন। তাহা না হইলে তাঁহার প্রতি ভক্তের প্রেমের পরিমাণটা ভাল করিয়া পরীক্ষা হয় না। সন্তানশোকে যদি কখন মাতার উন্মাদিনী হইবার অবস্থা হয় তবে ক্যাথেরিনের তাহা হইয়াছিল। কিন্তু ক্যাথেরিনের জীবন-তরু স্রোতস্বতী নদীর তীরে রোপিত ছিল। সাময়িক অনাবৃষ্টিতে সে জীবনে শুষ্কতা আসিল না। ঈশ্বরের প্রেমে, তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে ক্যাথেরিনের অটল বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস কিছুতেই টলিল না। এই দারুণ শোকের পর তাঁহার ধীর, শান্ত ভাব দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত

তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন—"তিনি প্রত্যেক বিষয়ই বিধাতার স্বহস্তের দান বলিয়া গ্রহণ করিতেন।"

বাহিরে শোকের উচ্ছ্বাস দেখা যাইত না বটে কিন্তু তাঁহার কোমল প্রাণে কি আঘাত লাগিয়াছিল তাহা তিনিই জানিতেন। শোকদগ্ধ চিত্তে একটু শান্তি ও কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহকে একটু বিশ্রাম দিবার প্রয়োজন হইল। অবশিষ্ট সন্তান দুই মাসের শিশু-কন্যাটীকে বুকে ধরিয়া দম্পতি কিছু দিনের জন্য কার্লাইল পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষত সুখের মধুর স্মৃতি শোকের গভীর ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণে অব্যক্ত বিষাদের ঢেউ তুলিতে লাগিল। পঞ্চ সন্তানের সমাধিমধ্যে ভাবী জীবনের কত আশা ও কল্পনা-জল্পনা নিহিত করিয়া শোকদগ্ধ দুটী নরনারী অনুরক্ত সহরবাসীর নিকট বিদায় লইলেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ নানা প্রকার মনোরম স্থানে তাঁহারা কিছু দিন ভ্রমণ করিলেন। কিন্তু আবার কার্লাইলের সেই গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এই কথা ভাবিতেই তাঁহাদের মনে ভয় হইত। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভগবানের এই বিশ্বাসী সেবক সেবিকার শোকে কাতর হইয়াছিলেন। পুত্রহারা মহারাণী ক্যাথেরিনের বেদনা বুঝিতে পারিলেন, তিনি ডাক্তার টেইটকে লণ্ডনের বিশপ নিযুক্ত করিয়া শোকে সহানুভূতি প্রকাশ ও গুণের সমাদর দুইই করিলেন।

বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্রে ক্যাথেরিনের কর্ম্মশক্তি আরো ফুটিয়া উঠিল। তিনি যেন নূতন শক্তি ও সাহস এবং অধিকতর ভক্তি-বিশ্বাস লইয়া নব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ৭০০ শত ধর্ম্মার্থী ডাক্তার টেইটের নিকট ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের প্রতি ক্যাথেরিনের সহৃদয়তার কোন না কোন স্মৃতি চিরদিন অন্তরে পোষণ করিয়াছেন। ডাক্তার টেইটের অধীনে প্রায় এক সহস্র ধর্ম্ম যাজক কর্ম্ম করিতেন। ক্যাথেরিন তাঁহাদের সকলের সহিতই ঘনিষ্ট পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যতদিন ডাক্তার টেইট লণ্ডনের বিশপ ছিলেন প্রতি বৎসরই ক্যাথেরিনের গৃহে এই সহস্র অতিথির সমাগম হইত; তিনি আনন্দে সকলের পরিচর্য্যা করিতেন। গ্রীষ্মকালে অনেক শনিবারে তিনি বন্ধুদিগকে উদ্যান-সম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করিতেন। ধর্ম্ম-প্রাণ গম্ভীরপ্রকৃতি ধর্ম্মযাজক, রাজনীতিবিদ পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী সাহিত্য-সেবকগণ সেখানে সম্মিলিত হইতেন, বহুসংখ্যক বালকবালিকাও সেখানে উপস্থিত হইত। ক্যাথেরিনের মধুর ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত হইতেন।

কিন্তু নিয়ত শিক্ষিত ও ধনবানদিগের সংসর্গে আসিতে হইলেও তিনি অশিক্ষিত ও দরিদ্রদিগের প্রতি উদাসীন হন নাই। বস্তুতঃ ইহাদিগকে লইয়াই তিনি নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। ইহাদিগের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি করিতে পারিতেন না এমন কার্য্য অল্পই ছিল। এমন অমায়িকতা ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরে তিনি তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন যে তাহারা সকলেই তাঁহাকে আপন পরিবারের লোক মনে করিত। নিকটবর্ত্তী দুইটী শ্রমজীবি-কার্য্যালয়ের শ্রমজীবিদিগের নিকট তিনি নিয়মিত রূপে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। দরিদ্র নিবাসের (Alms house) প্রতিও তাঁহার মনোযোগের ত্রুটী ছিল না। প্রতিদিন ঊষাকালে নিজ সন্তানগণের অন্তরে তিনি যে সকল সুশিক্ষার বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিতেন, বৃদ্ধদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাহাদিগের সেবা তন্মধ্যে একটী প্রধান বিষয় ছিল। প্রতি সপ্তাহে এক অপরাহ্ণে বৃদ্ধ ও পীড়িতদিগের পরিচর্য্যায় সন্তানগণ তাঁহার সঙ্গী হইত। তাহারা বাল-কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতে ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে উহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিত। সসন্তান ক্যাথেরিনের এই দরিদ্রসেবা দর্শকদিগের প্রাণে স্বর্গবাসী দেবতাদিগের উদার প্রেম ও সহানুভূতির কথা স্মরণ করাইয়া দিত। চতুষ্পার্শ্বে গরিবের এমন কুটীর একটীও ছিল না যেখানে তাঁহার সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল না। ক্রমে তিনি হাস্পাতাল গুলিতেও যাইতে লাগিলেন। যে সকল হাস্পাতালে নারীর পরিচর্য্যার বিশেষ সুবিধা তিনি সেইগুলিতেই বেশী যাইতেন।

(ক্রমশঃ)

পুরাণ প্রসঙ্গ।

ইতিহাসলেখকদিগের নিজ নিজ জাতিগত, সম্প্রদায়-গত অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, অথবা বিদ্বেষ-বুদ্ধির প্ররোচনায়, অথবা অন্য নানা কারণে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের চরিত্র ইতিহাসলেখকগণ কর্ত্তৃক অযথারূপে চিত্রিত হইবার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণের হস্তে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নরাধম রূপে চিত্রিত হইয়াছেন; নিরপেক্ষ লেখকগণ নেপোলিয়ন চরিত্রে ইংরেজ লেখক কর্ত্তৃক লেপিত কলঙ্ক অনেক পরিমাণে মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের দেশের হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণের হস্তে বিশেষ রূপে লাঞ্ছিত। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার "সিরাজউদ্দৌলা" নামক পুস্তকে সিরাজের কলঙ্কক্ষালনের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অতি অল্পদিনের কথা, রাজা নবকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া আমাদের দেশের এক জন সুপণ্ডিত ও সুবিখ্যাত লেখক মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি অতিশয় অবিচার করিয়াছেন।

কেবল যে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহা নয়, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে চিত্রিত আদর্শ চরিত্রগুলিও পরবর্ত্তী লেখকদিগের হস্তে পড়িয়া অল্লাধিক বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

রামায়ণ,মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; সংস্কৃত ভাষা জনসাধারণের বুঝিবার শক্তি নাই। যাঁহাদের কৃপায় সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত অমৃতময় উপাখ্যান ও উপদেশাদি প্রাদেশিক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। আমাদের দেশের কথকসম্প্রদায় এবিষয়ে অগ্রণী। এই কথকেরাই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয় অবলম্বন করিয়া কথকতা করিতেন। সেই কথকতা শুনিয়া সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ জন-সাধারণ রামায়ণ মহাভারতাদিতে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিত। কথকদিগের পরই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নাম করিতে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত না পড়িয়াছেন, লেখাপড়া জানা এমন লোক আমাদের দেশে কিছু দিন পূর্ব্বে ছিল না বলিলেই হয়। আমাদিগের অধিকাংশেরই রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে জ্ঞান ঐ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত হইতে লব্ধ। ইদানীং মূল রামায়ণ ও মহাভারতাদির সঠিক অনুবাদ বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল সমুদ্রবিশেষ অনুবাদগ্রন্থ পড়িবার ধৈর্য্য ও অবসর কয়জন লোকের আছে, বলিতে পারিনা। তাছাড়া, কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালীর মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এই দুই খানি গ্রন্থ যে বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি আদরের বস্তু তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাজারে যে সকল কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাওয়া যায় তাহা পাঠে মূল রামায়ণ মহাভারতাদিতে বর্ণিত আদর্শ চরিত্রগুলির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। মূল রামায়ণ-মহাভারতাদিতে বর্ণিত আদর্শ চরিত্রগুলির সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতাদিতে বর্ণিত ঐ সকল চরিত্রগুলির তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অম্বরচুম্বী হিমাচলের সহিত উই-ঢিপির যে সম্বন্ধ, বিশাল বনস্পতির সহিত এরণ্ড বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, মূল রামায়ণ-মহাভারতাদিতে বর্ণিত আদর্শ চরিত্রগুলির সহিত, কৃত্তিবাস-কাশীদাস-বর্ণিত আদর্শ চরিত্র গুলিরও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। কৃত্তিবাস কাশীদাসাদি মূল পুস্তকের মহান্ আদর্শগুলি খাটো করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের দেখাদেখি যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালারা সে গুলিকে আরও ছাটিয়া দিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়া, জানিয়া শুনিয়াই যে তাঁহারা এই সকল আদর্শ চরিত্রগুলিকে বিকৃত করিয়াছেন, তাহা বলিতেছিনা, কিন্তু হইয়াছে ঐরূপ। ইহা আমাদের জাতীয় উন্নতি সাধনের একটি প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

কয়েকটি দৃষ্টান্তদ্বারা আমার কথা বুঝার রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের ঘটনা। বিশ্বামিত্র মুনি মিথিলায় যজ্ঞরক্ষার্থে মহারাজ দশরথের নিকট হইতে রামকে লইতে গিয়াছেন। দশরথ রাজা প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়া পরিশেষে রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র মুনির সহিত মিথিলার যজ্ঞ-বিঘ্ন নিবারণের জন্য প্রেরণ করিলেন। এবিষয়ে মূল বাল্মীকি-রামায়ণে এই পর্য্যন্ত। এই বিষয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিরূপ লিখিত হইয়াছে দেখুন। দশরথ রাজা যখন দেখিলেন যে বিশ্বামিত্র মুনি রামকে না লইয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন রাজা এক ফন্দি ঠাওরাইলেন। রাজার মনে সর্ব্বদাই অন্ধ মুনির অভিশাপ জাগিয়া আছে, কবে রাম-বিহনে প্রাণ যাইবে। তাই দশরথ করিলেন কি, ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্র মুনির নিকট আনিয়া বলিলেন, "এই রামলক্ষ্মণকে লইয়া যাউন।" সরলচিত্ত বিশ্বামিত্র মুনিও সন্দেহমাত্র না করিয়া, রামলক্ষ্মণ মনে করিয়া ভরতশত্রুঘ্নকে লইয়া চলিলেন। খানিক দূর গিয়া কি জানি কেন বিশ্বামিত্র মুনির মনে বুঝি সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন যে এরা ছুটি প্রকৃত রামলক্ষ্মণ কিনা পরখ করিতে হইবে। অমনি তিনি ভরতশত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপু রামলক্ষ্মণ, তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই খান হইতে মিথিলা যাইবার দুইটি পথ। এক পথ দিয়া গেলে এক প্রহরে মিথিলা যাওয়া যায়, কিন্তু সে পথে যাইতে "বড় ভয় বাসি, পথের মধ্যেতে আছে তাড়কা রাক্ষসী", আর এক পথে গেলে তিন দিন লাগিবে, সে পথে কিন্তু কোন ভয় নাই। এখন কোন্ পথ দিয়া যাইতে ইচ্ছা কর।" ভরতশত্রুঘ্ন বলিলেন, "মুনিবর, দুষ্টজনে ঘাঁটাইয়া ফল কি, তিন দিনের পথে মিথিলা যাওয়াই ভাল। একথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, যে রাম তিন কোটী রাক্ষস মারিবেন, সেই রাম যে তাড়কা রাক্ষসীকে ভয় করিবেন, এ কথন হইতে পারে না, অতএব—"এজন না হইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।" রাজা আমাকে ভরতশত্রুঘ্ন দিয়া ভাঁড়াইয়াছেন। অমনি ভরতশত্রুঘ্নকে লইয়া বিশ্বামিত্র ফিরিলেন। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া ক্রোধদৃষ্টে অযোধ্যার পানে চাহিলেন,অমনি অযোধ্যার ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়া গেল। অযোধ্যার লোকেরা রামলক্ষ্মণকে এ সংবাদ দিলেন। অমনি রামলক্ষ্মণ—"ধেয়ে আসি পড়িলেন মুনির চরণে।" তখন মুনি অমৃত দৃষ্টে অযোধ্যার পানে চাহিলেন, আর যেমনটি ছিল তেমনি হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলায় চলিলেন। কিছুদূর গিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন রামলক্ষ্মণকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম বলিলেন যে, "শীঘ্র যাহাতে মিথিলায় পৌছিতে পারি তাহাই করিব। সোজা পথ দিয়াই যাইব, তাড়কাকে ভয় করি না।" দীনেশ বাবু এবং সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ ক্ষমা করিবেন, কৃত্তিবাস ঠাকুর প্রকৃত পক্ষে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন কি না ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বাজারে যে সকল কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া যায় এবং যাহা কিনিয়া সকলে পড়িয়া থাকে, সেই সকল কৃত্তিবাসী রামায়ণেই এই রূপ কথা লিখিত আছে। এস্থলে কৃত্তিবাসের দশরথ রাজা প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী রূপে চিত্রিত, অথচ ইনিই সত্যপালনের জন্য রামকে বনে দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন; ভরতশত্রুঘ্নকে ভীরুর একশেষ করা হইয়াছে। বিশ্বামিত্র মুনির ব্রহ্মতেজ ও রামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া দশরথ, ভরতশত্রুঘ্ন এবং খোদ বিশ্বামিত্র মুনিকেও মাটি করিয়া ফেলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এরূপ দৃষ্টান্তের নিতান্ত অভাব নাই।

কাশীদাসী মহাভারত হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের দুর্ভাগ্য যে তিনি এদেশে স্বয়ং ভগবান্ রূপে পূজিত; অথচ এমন দুষ্কার্য্য নাই যা কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণকে দিয়া না করাইয়াছেন। একে ত মূল গ্রন্থেই প্রক্ষিপ্তের ছড়াছড়ি, তাহাতে পরবর্ত্তী বাংলা ভাষার লেখকগণ আরও রং চড়াইয়াছেন। ভীষ্মপর্ব্ব হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভীষ্ম আট দিন যুদ্ধ করিয়াছেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের বহুতর সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছেন।

দুর্য্যোধন অতিশয় চিন্তিত হইয়া কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত ইহার প্রতিবিধানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কর্ণ বলিলেন যে, "আপনি শোক করিবেন না। আমি আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান করিব। আপনি ভীষ্মকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত করুন। তাহা হইলে আমি অস্ত্রধারণ করিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব। ভীষ্ম সতত পাণ্ডবগণকে দয়া করেন, তিনি তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। শান্তনুনন্দন কেবল রণাভিমানী ও রণপ্রিয়, তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা নাই। সুতরাং তিনি কিরূপে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন? অতএব আপনি ভীষ্মের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে অস্ত্রত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। তিনি অস্ত্রত্যাগ করিলেই আপনি অতি শীঘ্রই সুহৃদবান্ধব সমেত পাণ্ডু-পুত্রগণকে মৎকর্ত্তৃক নিহত দেখিবেন।" কর্ণের কথামত দুর্য্যোধন ভীষ্মের শিবিরে গিয়া কহিলেন, "হে অরাতি নিপাতন, আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া সবান্ধব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেব ও দানবগণকে সমরে পরাজয় করিতে সাহস করি। অতএব মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনি কৃপা করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাজয় করুন। আমি সমুদয় সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও করূষগণকে সংহার করিব। হে মহাত্মন্, আপনি যদি পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া বা আমার প্রতি দ্বেষবশতঃ অথবা আমার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে সমর-দুর্ম্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন, তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন।" এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন নীরব হইলেন।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্যশেলে পীড়িত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো কথাই কহিলেন না। অবশেষে ক্রোধ সংবরণ করিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "আমি যথাশক্তি যত্নবান্ ও প্রাণরক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাপি তুমি আমার প্রতি কি নিমিত্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? পাণ্ডবেরা খাণ্ডবদাহ করিয়া অগ্নিকে তৃপ্ত করিয়াছেন; গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক তোমাদিগকে গ্রহণ করিলে সূতপুত্র ও তোমার সহোদরেরা পলায়ন করে, ভীমার্জ্জুন তোমাদিগের উদ্ধার সাধন করেন। বিরাট নগরে মহাবল অর্জ্জুন একাই আমাদের সকলকে পরাজয় করেন। এই সমস্তই পাণ্ডবদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। হে মহারাজ, মোহপ্রযুক্ত তুমি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান রহিত হইয়া গিয়াছ। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি সকল বৃক্ষকেই সুবর্ণময় নিরীক্ষণ করে, তেমতি তুমিও সমস্ত বিপরীত দেখিতেছ। আজ দেখিব, তুমি পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত বৈরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া কিরূপ যুদ্ধ কর। আমি শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার প্রীতি বর্দ্ধন করিব। তুমি সুখে নিদ্রা যাও। আমি কল্য মহাযুদ্ধ করিব। হে মহারাজ, যত দিন এই পৃথিবী থাকিবে তত দিন লোকে আমার এই মহাযুদ্ধ কীর্ত্তন করিবে।"

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া স্বশিবিরে গমন করিলেন। পরদিবস ভীষ্ম অতি ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ অন্যমনস্ক হইতেছেন ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নামিয়া কৃষ্ণকে নিবারিত করিলেন ও অতঃপর প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল ভারতযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না, তবে যে কৃষ্ণ ভীষ্মকে বধ করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহা সারথির কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। মূল মহাভারতের বৃত্তান্ত এইমাত্র। ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হওয়াতে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছিল কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে কৃষ্ণের চাতুরী কি কপটতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না! এ স্থলে, কি দুর্য্যোধন,

কি কর্ণ, কি ভীষ্ম, কি কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন সকলেই সমরনীতি-বিশারদ ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন দেখিতে পাই।

এবিষয় কাশীরাম দাস কিরূপ লিখিয়াছেন দেখুন।

সপ্তম দিবসের যুদ্ধশেষে, রাত্রিকালে, দুর্য্যোধন ভীষ্মের শিবিরে গিয়া বলিলেন, "পিতামহ, আপনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। আপনার সংগ্রামে দেব-দৈত্য-নর কেহই স্থির থাকিতে পারে না। যে পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন তিনিও আপনার নিকট যুদ্ধে পরাজিত। অথচ আপনি এই সাত দিন যুদ্ধ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে পারিলেন না?

"যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে,
অপযশ তোমার যে ঘুষিবেক সবে।
রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর,
তূণ হইতে পঞ্চ শর করিল বাহির।

* * *

মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন।
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবী-নন্দন,
কোনো ভয় নাই তব শুন দুর্য্যোধন।
কল্য রণে পাণ্ডবে মারিব এই শরে,
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে।"

দুর্য্যোধন এই কথা শুনিয়া অস্ত্রগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং মহানন্দমনে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে ঠিক সেই সময়ে পাণ্ডবশিবিরে কৃষ্ণ সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহদেব, গণনা করিয়া বল দেখি, কাল কেমন যুদ্ধ হইবে?" কাশীরাম দাসের মহাভারতে সহদেব গণকঠাকুর, কিন্তু ব্যাসের মহাভারতে সহদেবকে কোনস্থানেই গণক বলা হয় নাই। মূল মহাভারতে লিখিত আছে যে, "ন্যায়পর সহদেব উশনা-প্রণীত নীতি-শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।" সহদেব কৃষ্ণের কথামত গণিয়া বলিলেন যে ভীষ্ম আমাদিগকে বধ করিবার জন্য পঞ্চ শর বাহির করিয়াছেন, আর আমাদের নিস্তার নাই।

"পাণ্ডবের হর্ত্তাকর্ত্তা তুমি মহাশয়,
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে উচিত হয়।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির সহদেবের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। তখন

"শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা চিন্তা কি করহ,
বীরবর অর্জ্জুনে আমার সঙ্গে দেহ।
ছল করি ভীষ্মস্থানে আনি পঞ্চ বাণ,
অনিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,"তা কেমন করিয়া হইবে?" কৃষ্ণ বলিলেন যে, "ইতিপূর্ব্বে দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্বেরা বাঁধিয়া লইয়া যায়। অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে মোচন করেন। সেই সময় দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে বর দিতে চাহেন। অর্জ্জুন বলেন যে এখন বর মজুদ থাকুক, ইহার পর আবশ্যক হইলে লইব। আজ সেই বর লইয়া কার্য্য উদ্ধার করিব।" কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া দুর্য্যোধনের শিবিরের দিকে গেলেন। অর্জ্জুন শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কৃষ্ণ বাহিরে রহিলেন। দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে দেখিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে, "কিহেতু আগমন, যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ।" অর্জ্জুন কৃষ্ণের শিক্ষামত বলিলেন যে, গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিলে আপনি আমাকে বর দিতে চান। আমি তখন সে বর লই নাই, পরে লইব বলি। এখন সেই বর প্রার্থনা করিতেছি; আপনার মুকুট আমাকে দিতে হইবে।" দুর্য্যোধন বিনা বাক্য ব্যয়ে মুকুট অর্জ্জুনকে দিয়া সাদরে বিদায় দিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে সেই মুকুট মাথায় দিয়া ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, ভীষ্ম দুর্য্যোধনের মুকুট-ধারী অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধন মনে করিয়া বলিলেন,

"কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন,
এত রাত্রে কি জন্য হেথায় আগমন।
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর,
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর।
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিলা সেই ক্ষণে
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে।

হেন কালে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন,
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ।

তখন ভীষ্ম কৃষ্ণকে বলিলেন যে, "তুমি যেমন আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, কালি যুদ্ধে আমিও তোমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব। তোমাকে যুদ্ধে অস্ত্র ধরাইব।" পর দিবস যুদ্ধে কৃষ্ণ ভীষ্মকে মারিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন। এই বিষয়টি মতি রায়ের "ভীষ্মের শর-শয্যা" গীতাভিনয়ে আছে। মতি রায়ের "ভীষ্মের শরশয্যা" পালার কল্যাণে উহা দেশের সর্ব্বত্র অতি উত্তমরূপে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দুর্য্যোধনের আতিথ্য-সংকারের প্রশংসা করিতে হয়, ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, একথা মনে করিলে কৃষ্ণভক্তদের চিত্ত ভক্তিতে গদগদও হইতে পারে; কিন্তু মানুষভাবে দেখিলে কৃষ্ণ বা অর্জ্জুনের চরিত্রে কিছুমাত্র শ্রদ্ধা হইতে পারে না। অথচ মূল মহাভারতে এ সকল ব্যাপারের উল্লেখ মাত্র নাই। "অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন", এই মিথ্যা কথা যে অর্জ্জুন কিছুতেই বলিতে স্বীকার করেন নাই,সেই অর্জ্জুনই কাশীরাম দাসের হাতে পড়িয়া অম্লানবদনে এত বড় একটা জুয়াচুরি করিয়া বসিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গমহিলা।

স্বদেশী আন্দোলন ত আরম্ভ হইল; শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু অনেকের আশঙ্কা হইল, পাছে বা ব্যাপারটা মেয়েরাই পণ্ড করিয়া ফেলে, মেয়েদের জন্যই সংকল্প রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়! কারণ অধিকাংশ মেয়েরই শিক্ষা সামান্য, চিন্তার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ; সূক্ষ্ম-রাজনীতির মধ্যে তাঁহাদের বুদ্ধিই প্রবেশ করিবে না। তাঁহারা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের অনিষ্টকারিতা কিরূপে বুঝিবে? বুঝিলেও নয়নতৃপ্তিকর ও মনোমুগ্ধকর বিলাতি জিনিস তাঁহাদের চোখে যে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ে যে কুহক-জাল বিস্তার করিয়াছে, তাঁহাদের কি সাধ্য আছে যে,বিলাতি দ্রব্যের মোহ হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবেন, —আদর করিয়া স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিবেন? তা যদি ঘরের মেয়েরাই বিলাতি দ্রব্য বর্জ্জন করিতে না পারেন, —আমাদের বাহিরে গিয়া গোরার উগ্রমূর্ত্তি এবং ঘরে আসিয়াও গৃহকর্ত্রীর রুক্ষমূর্ত্তিই দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমরা আমাদের সংকল্প কতদিন অটুট রাখিতে পারিব?

কিন্তু এই কয়েক মাসের মধ্যে আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম, মেয়েরা যথেষ্ট শিক্ষা পান নাই বটে, তথাপি তাঁহারা স্বদেশের কল্যাণের জন্য পুরুষদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইবার অযোগ্য নহেন। তাঁহারা জটিল অর্থনীতি ও কুটিল রাজনৈতিক ব্যাপারের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না সত্য; কিন্তু হিন্দু নারীর স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা এখনো তাঁহাদের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রয়োজন হইলে এখনো তাঁহারা জননী জন্মভূমির নামে পুরুষের ন্যায়ই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিতা হইতে পারেন এবং বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিলাস-বাসনাও বর্জ্জন করিতে পারেন। যদি তাঁহারা তাহা না পারিতেন, তাঁহারা যদি পুরুষদিগের ন্যায় দৃঢ় সংকল্পের সহিত বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিতে না চাহিতেন, তাহা হইলে কখনই এত সহজে স্বদেশী আন্দোলন সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িত না।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতেই এই প্রবন্ধলেখক মফঃস্বলের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিয়াছেন যে, পুরুষেরা যেরূপ উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিতেছেন, রমণীগণ ঠিক সেইরূপ উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিতই বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিতেছেন। বরং কোন কোন স্থলে রমণী-দিগের উৎসাহই অধিক দেখা গিয়াছে। আমরা এমন একটি পরিবারের কথা জানি যে, সেই পরিবারের পুরুষ-দিগের বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে তেমন উৎসাহ নাই।

কিন্তু সেই পরিবারের শিক্ষিতা মহিলাগণ চা-এর জন্য একটা পয়সার জার্ম্মানীর চিনি গৃহে আনিতেও রাজি নহেন। তাঁহারা ছিন্ন-বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেও প্রস্তুত, তথাচ বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করিতে অসম্মত। কয়েক মাস খালি হাতে রহিয়াছেন, তবু বিলাতি চুড়ি কিনিয়া ব্যবহার করেন নাই। আমরা একজন সম্ভ্রান্ত বেহার-প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা শুনিলাম যে, তাঁহার পরিবারের পুরুষেরা উত্তম বিলাতী বস্ত্র পরিতে লজ্জা বোধ করেন না, কিন্তু মহিলারা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট বিলাতি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অতি সামান্য রকমের দেশী কাপড় পরিয়াও আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা মনে করেন। এই অল্পদিন হইল কোন একটা কলেজের অধ্যক্ষের নিকট শুনিলাম, যে একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিকট স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সামান্য দু একটা কথা মাত্র বলিয়াছিলেন। কিন্তু ডেপুটি বাবুর পত্নী সেই কথা শুনিয়া মনের ক্ষোভে একদিন অনাহারে ছিলেন। তার পর ডেপুটি বাবু যখন বলিলেন "তুমি দুঃখ করিও না, আমি স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে", তখন তাঁহার পত্নী অন্ন গ্রহণ করিলেন।

মেয়েরা শুধুই যে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনে পুরুষদিগের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে স্বদেশের অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহারা উৎসাহান্বিতা হইয়াছেন। এ স্থানে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহিলাদিগের সভা সমিতি ও কার্য্যাদির বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

সর্ব্ব প্রথমেই ময়মনসিংহের মহিলাদিগের সভার কথা উল্লেখযোগ্য। নারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই সভা করিয়া বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়। যখন লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-বিভাগের ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তখন আমরা ধর্ম্ম প্রচারোপলক্ষে ময়মনসিংহ গিয়াছিলাম। একদিন উক্ত স্থানের ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আমাদের বক্তৃতা হইতেছিল। বক্তৃতার সময় দেখা গেল, কয়েকজন মহিলা গৈরিক বস্ত্র পরিয়া বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছেন। তার পর আমরা যে বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম, দেখিলাম, সেই বাড়ীর একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পরণেও গৈরিক বস্ত্র। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের জন্য ময়মনসিংহের কয়েকজন মহিলা শোকচিহ্ন স্বরূপ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এবং তিন দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা 'বরণ কোম্পানী'র অপমানিত কেরাণীদিগের জন্যও চাঁদা তুলিতেছিলেন। ময়মনসিংহের রমণীদিগের এই স্বদেশানুরাগ অনুকরণযোগ্য।

ময়মনসিংহের পরই কলিকাতায় ভদ্রগৃহের রমণীদিগের এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে এদেশে কখনও কোন সভায়ই বোধ হয় নানা শ্রেণীর এত অধিকসংখ্যক মহিলার সমাগম হয় নাই। এ সভায় কয়েকজন মহিলা উৎকৃষ্ট রচনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপাতমনোরম ও অত্যুজ্জ্বল বিদেশী বিলাসদ্রব্যের প্রভাবে যে দেশের রাশি রাশি অর্থ বিদেশে যাইতেছে এবং ঐ সকল বিদেশীয় সামগ্রীর প্রভাবে যে দেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে অযথা বিলাসিতা বৃদ্ধি হইয়াছে, তজ্জন্য মহিলাদিগের যে স্বদেশী জিনিসের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য;—এ কথা তাঁহারা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।

কলিকাতা ব্যতীত ঢাকা, বরিশাল, বাঁকিপুর প্রভৃতি আরো কয়েকটি জায়গায় মহিলাদিগের সভাসমিতির বিশেষ বিবরণ আমরা অবগত আছি। বিগত পূজার ছুটি উপলক্ষে ঢাকার খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগরের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার বসু, বাঁকিপুরের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য লোক কর্ম্মাটারে গমন করিয়াছিলেন। রাখি-বন্ধনের দিন তথায় পুরুষদিগেরও যেরূপ একটি সভা হইয়াছিল, তেমনি মহিলাদিগেরও একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহিলাগণ সেই সভায় পরস্পরের হস্তে রাখি-বন্ধন করেন। তা ছাড়া বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করিবেন না বলিয়া সংকল্প করেন,

এবং স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্যের জন্ত আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করেন।

বাঁকিপুরের পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে রমণীগণ যে একটি মহৎ অনুষ্ঠান করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। রমণীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে সহরের অনেক উদার প্রকৃতি-সম্পন্ন বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুরুষদিগের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন এবং সঙ্গীত, আবৃত্তি ও প্রার্থনাদি করেন। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও প্রার্থনায় তাঁহাদের স্বদেশভক্তি এবং অন্তরের উচ্চাভিলাষই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা নারীজাতির অবস্থার উন্নতি করিতে এবং স্বদেশের কার্য্যে নারীদিগকে সঙ্গিনী করিয়া লইতে পুরুষদিগকে অনুরোধ করেন। সে দিন যখন উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া সভা ভঙ্গ হইল, তখন সমবেত পুরুষ ও নারীকণ্ঠের "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে আমাদের হৃদয়ে যে আশা ও উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে মহিলাগণ যে সকল সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, তাহার একটা সঙ্গীতের কিয়দংশ এই :—

"সঙ্কল্প লইব নব, বোনেরা সহায় হব,
ভাই যবে দিবে প্রাণ স্বদেশের তরে,
যদি মানবের দুখে, ভাই থাকে ম্লান মুখে,
বোনেরা করুণা লয়ে যাবে ঘরে ঘরে।"

যাহা হো'ক বঙ্গমহিলাগণ স্বদেশী আন্দোলনের কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ সংক্ষেপে তাহাই বর্ণনা করিলাম। কিন্তু মহিলাদিগের এই সকল কার্য্য এবং তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে। বহুদিন পূর্ব্বে সূক্ষ্মদর্শী স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তৎপ্রণীত "আনন্দমঠ" উপন্যাসে বাঙ্গালীকে যে কয়েকটি কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটা কথা এই যে—বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা শুধুই যে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র যে কেবল রান্নাঘরের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই রুদ্ধ থাকিবে, তাহা নয়। সুশিক্ষা ও সুযোগ পাইলে, উপযুক্ত অবস্থায় পড়িলে, তাঁহারা বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বদেশের কার্য্যেও আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন। কিন্তু এতদিন এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। রমণীদিগের উচ্চশিক্ষা ও অবস্থার উন্নতির কথা হইলেই অনেকে বলিতেন, "আমাদের মেয়েরা ত বেশ আছে। তাহারা স্বামীকে ভালবাসে, শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করে, সন্তানদিগকে স্তন্যদান করে;—তাহাদের অভাব কি? তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার চেষ্টা কেন? তাহারা কি কাণে কলম গুজিয়া কেরাণী সাজিয়া আফিস করিবে?—মেয়েদের ঘর হইতে আবার বাহিরে ডাকা কেন?"

কিন্তু দেখিতেছি, পুরুষেরও যেমন ঘরের কাজ, বাহিরের কাজ দুই-ই আছে; মেয়েদেরও তাই। বাঙ্গালী এতদিন নিজের সুখদুঃখ লইয়া, স্বার্থপর হইয়া আপনাকে আপনার ঘরের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল,—বাহিরের ভাই ভগিনীর কথা, জননী জন্মভূমির কথা ভুলিয়াছিল, তাই ত দেশেরও দুর্গতির সীমা পরিসীমা ছিল না। আর আজ সেই বাঙ্গালী ঘর হইতে আপনাকে বাহিরে আনিয়াছে, দেশের কাজে একটু মন দিয়াছে, সেজন্য চারিদিকেই উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এখন বাঙ্গালী রমণীদিগকেই বা কেবল ঘরের ভিতর গৃহকর্ম্মে ও আপন আপন পরিবারের স্বার্থের সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ রাখিলে চলিবে কেন? স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে, এখন এই কর্ম্মক্ষেত্রে বিপুল জনসঙ্ঘের সহিত মিলিত হইয়া নারীদিগেরও মাতৃভূমির সেবা করা প্রয়োজন হইয়াছে। বঙ্গমহিলাগণ সেই প্রয়োজন যে কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা ও অবস্থার অনুরূপ দেশের কার্য্য যে কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের সভাসমিতি ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা তাহারই প্রমাণ পাওয়া গেল।

এখন স্বদেশহিতৈষীদিগকে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। প্রথমতঃ কিরূপে উচ্চশিক্ষাদ্বারা রমণীদিগের অবস্থার উন্নতি করা যায়, তাহার সুবন্দোবস্ত

করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ রমণীদিগের জন্ত উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

আমরা স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, পুরুষদিগের শক্তির সহিত নারীশক্তির সম্মিলন হওয়াও প্রয়োজন। কারণ আমরা আগেই বলিয়াছি, গৃহের স্ত্রীলোকেরা সহায় না হইলে আমরা কিছুতেই আমাদের সংকল্প রক্ষা করিতে পারিতাম না। তদ্ভিন্ন রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানীদিগের উন্নতির বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াও বুঝিতে পারিয়াছি, স্বদেশকে উন্নত করিতে হইলে, পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি হওয়া আবশ্যক। জাপানীগণ সুশিক্ষার জন্ত শুধুই ত পুরুষদিগকে বিদেশে পাঠান নাই; এক দল রমণীকেও আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। রমণীদিগের সাহায্যেই জাপানের সর্ব্বত্র অতি সুন্দররূপে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইয়াছে। এবং সেই সুশিক্ষার ফলে রমণীগণ জাতীয় গৌরবের মাহাত্ম্যও বুঝিয়াছেন;—এরূপ ভাবে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারাই সন্তানদিগের চিত্তে জাতীয় গৌরব-স্পৃহা উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং স্বামী ও সন্তানদিগকে সর্ব্বপ্রকার স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে সাহায্য করিতেছেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ সুশিক্ষিত যুবকের মধ্যেই যে মহত্ত্ব, নিঃস্বার্থ ভাব ও গৌরবস্পৃহা পরিলক্ষিত হয় না, তাহার কারণ কি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যান্ত কারণের মধ্যে তাহাদের শৈশব-শিক্ষার অভাবই একটি প্রধান কারণ। বাঙ্গালা দেশের শিশুগণ যখন জননীর স্তন্তপানের সঙ্গে সঙ্গে জননীর অন্তরের ভাব গ্রহণ করে, এবং তদ্দ্বারা শরীর ও মন পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তখন জননীর কোন্ আকাঙ্ক্ষা, কোন্ অভিলাষের দ্বারা তাহাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির হইয়া থাকে? বঙ্গীয় জননীগণ মনে ভাবেন, ছেলেটি যদি বি, এ, এম্, এ, পাশ করিয়া উকীল কিম্বা হাকিম হইতে পারে, একটি সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া আসিয়া তাহার সুকুমার দেহলতা প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজির ন্যায় স্বর্ণালঙ্কারে সুশোভিত করিতে পারে;—এবং তাহা দেখিয়া যদি পাড়া প্রতিবেশিনী মহিলাগণ বলিতে থাকে,—"আহা, কি সুসন্তানই গর্ভে ধরেছ, বধূটীর সর্ব্বাঙ্গ সোণায় একেবারে মুড়ে দিয়েছে." তাহা হইলেই তাঁহারা কৃত-কৃতার্থ হন। কাজেই সন্তানদিগের অন্তরে রমণীগণ তাঁহাদেরই বাসনানুরূপ শিক্ষার বীজ বপন করেন। সেই শৈশব-শিক্ষার ফলে শিক্ষিত যুবকদিগের অন্তরে কোন প্রকার উন্নত যশোস্পৃহা কিম্বা গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয় না। যুবকেরা প্রাণপণ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন; অর্থদ্বারা পত্নীদিগের স্বর্ণাঙ্গ অথবা শ্যামাঙ্গ কিম্বা কৃষ্ণাঙ্গ স্বর্ণাভরণে বিভূষিত করেন; তদ্ভিন্ন স্বদেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য প্রবল অনুরাগ এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিবার দৃষ্টান্ত কয়জন যুবকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়?

কিন্তু জাপানী মহিলাদিগের ন্যায় বঙ্গরমণীগণ যদি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন; যদি স্বদেশের দুর্গতি ও অভাব বুঝিতে পারেন; যদি স্তন্তদানের দ্বারা সন্তানদিগের শরীর পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে এই কথাটা বুঝাইয়া দিতে পারেন যে—হে সন্তানগন, এই যে হৃদয়ের শোণিত পান করাইয়া তোমাদিগকে মানুষ করিতেছি, ইহা কিসের জন্ত? ইহা কি বি, এ, পাশ করিয়া একটি সুন্দরী বালিকাবধূ ও তাহার সঙ্গে শ্বশুরের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ গৃহে আনিবে, সেই জন্ত? না, তাহা নয়। তোমরা শরীরের শক্তি, মনের চিন্তা, উপার্জ্জিত অর্থ জননী জন্মভূমির চরণে অর্পণ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবে, নিজেরা যশস্বী হইবে এবং আমাদিগকে গৌরবান্বিতা করিবে—সেই জন্ত। তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, বাঙ্গালী স্বদেশকে ভালবাসিতে শিখিবে, বাঙ্গালী দেশের কাজে শক্তি দিয়া, প্রাণ দিয়া, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবে।

সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই রমণীদিগের সুশিক্ষার দ্বারা তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন, একটী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যেক সহরে ও পল্লীগ্রামে অন্তঃপুরস্থ

মহিলাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ রমণীদিগের জন্য উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা শিক্ষিত রমণীদিগের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত, তাঁহারা অনেকে জানেন, অনেক রমণী তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তি, সুবিধা ও অবসর অনুসারে স্বদেশের কল্যাণার্থ কিছু কিছু কাজ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা যে কিরূপ প্রণালীতে কি কাজ করিবেন, তাহাই ভাবিয়া পান না, সুতরাং বাঙ্গালাদেশে সত্বর বঙ্গমহিলাদিগের জন্য উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার উন্মোচন হওয়া আবশ্যক।

এজন্য কলিকাতা সহরে এবং প্রত্যেক জেলায় বঙ্গমহিলাদিগের এক একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। যে সকল মহিলা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং সহিত্য ও সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া মোটা মুটি দেশের সংবাদাদি অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই অগ্রণী হইয়া ঐ সকল সমিতির কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন। আমাদের মনে হয়, কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাগণ মিলিত হইয়া যদি একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন, তাহা হইলে সেই সমিতির দ্বারা এদেশে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহারা আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন; চাঁদা তুলিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু এবং মুসলমান মহিলাদিগের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন; নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগকে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে পারেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহারা গবর্ণমেন্টের নিকট ও সমাজের নেতাদিগের নিকট আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা প্রতি জেলায় আপনাদের শাখাসমিতি স্থাপন করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে নানা প্রকারে পুরুষদিগের সাহায্য করিতে পারেন। চতুর্থতঃ গরীবের ঘরের মেয়েরা তাঁত বুনিয়া যাহাতে স্বহস্তে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন। *

কিন্তু এ সকল কার্য্য করিতে হইলেই রমণীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্, সচ্চরিত্র, উন্নতিশীল, সুশিক্ষিত, স্বদেশহিতৈষী পুরুষদিগের সাহায্য প্রয়োজন। নচেৎ মহিলাগণ নিজেরা চেষ্টা করিয়া বিশেষ কিছুই করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া রমণীদিগের একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকাও উচিত নয়। তাঁহারা পুরুষের মুখের দিকে ত অনেক দিনই চাহিয়া রহিয়াছেন। এবার স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহারা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া যেমন অনেক সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেছেন, সেইরূপ আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ও দেশের কার্য্যের নিমিত্ত যদি স্থায়ীভাবে সভাসমিতি স্থাপন করিয়া কোন মহৎকার্য্যের সূচনা করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের শক্তির বিকাশ হইবে, তাঁহাদিগের সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত হইবে, তাঁহারা দেশের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবেন; এবং পুরুষদিগের শক্তির সহিত আপনাদিগের শক্তি সম্মিলিত করিয়া যথার্থই জননী জন্মভূমিকে শক্তিশালিনী করিয়া তুলিতে পারিবেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

---

* কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বেই এই প্রকার একটী মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় মহিলাগণের স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক বিরাট সভা এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারাই আহূত হইয়াছিল। নাটোরের মহারাণী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী এই সভার সভাপতি এবং বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু ইহার সম্পাদিকা। আমরা আশা করি এই সভা ক্রমে ক্রমে প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের বাঞ্ছিত সমিতিতে পরিণত হইবে।

ভাঃ মঃ সঃ।

ভারত-মহিলা।

তোমরা ত ছিলে মাতঃ, ভারত-মন্দিরে
চির বন্দনীয়া মহাদেবীর প্রতিমা ;
তোমাদেরি পদরজঃ গর্ব্বে ধরি শিরে
আমরা অর্জ্জিনু বিশ্বে অতুল মহিমা !

তোমাদেরি মাঝে কত লভিলা জনম
সাবিত্রী, গান্ধারী, গার্গী, দময়ন্তী, সীতা ;
মোদের জাতীয় কাব্য সদা অনুপম
গাইয়াছে তোমাদেরি আরাধনা-গীতা !

তোমরা গো রচেছিলে প্রতি গৃহে গৃহে
শান্তিময়, পুণ্যময়, পূত তপোবন ,
নিশিদিন তোমাদের অযাচিত স্নেহে
করিতেছিলাম সবে জীবন যাপন !

তোমরাই বীরমাতা বীরজায়া বেশে
মোদেরে সাজায়ে দিতে সমর সজ্জায় ;
দেশের কল্যাণ তরে আপনিও হেসে
ধরিতে শাণিত অসি চামুণ্ডার প্রায়।

আমাদের অতীতের কত সুখ স্মৃতি
তোমাদের গৌরবেতে রয়েছে উজ্জ্বল ;
বারেক স্মরণে প্রাণে জেগে উঠে প্রীতি,
অশ্রুবিন্দু রচি দেয় অর্ঘ্য নিরমল !

কিন্তু আজি কি কলঙ্ক ! তোমরা 'অবলা',
আমাদেরি মুখ চাহি করিতেছ বাস ;
মূঢ় মোরা তোমাদিগে করি অবহেলা
সহিতেছি নিয়তির তীব্র উপহাস !

তথাপি মা, মনে হয় পুনঃ ধীরে ধীরে,
বহিতেছে সুবাতাস ভারতে সর্ব্বথা ;
তোমরা দিতেছ দেখা পূজার মন্দিরে,
'ভারত-মহিলা' নামে করি সার্থকতা !

হে জননী, দয়াময়ী, কল্যাণদায়িনী,
আমাদেরে কর ক্ষমা, দাও সঞ্চারিয়া
নবীন শকতি প্রাণে ; দিবস-যামিনী
ধন্য হই আর বার মায়েরে পূজিয়া !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

ব্রহ্মাণ্ড।

সূচনা।

যাহার শেষ আছে, আর যাহার শেষ নাই, এরূপ দুটী জিনিসের মধ্যে কোনরূপ তুলনা হইতে পারে না। সুতরাং সসীমকে দেখিয়া এরূপ কথা বলা চলে না যে অসীমের কিছু বুঝিলাম। আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই কথাটী বিশেষ করিয়া স্মরণ করি। ভগবানের সৃষ্টি অনন্ত, তাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র আমাদের জ্ঞানের গোচরে আসিতে পারে, কারণ আমাদের দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ। শুধু চোখে যাহা দেখি, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক সহস্রগুণ অধিক দেখা যায়, একথা মানিলাম ; কিন্তু সেই দৃষ্টিরও শেষ আছে। সুতরাং ইহাতেও বাস্তবিক অনন্ত সৃষ্টির কিছুই দেখা হয় না।

ইহাতে আমাদের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। আমাদের ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির পক্ষে এই সামান্য দেখারও মূল্য অনেক। অগাধ সমুদ্র হইতে এক বোতল জল তুলিয়া আনিলে, সমুদ্রের পক্ষে তাহা কিছুই হয় না। কিন্তু বোতলের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় "ব্রহ্মাণ্ড" ; সচরাচর পরিদৃশ্যমান জগত (visible universe) বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহাকেই এস্থলে ব্রহ্মাণ্ড বলা হইতেছে।

পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মার ডিম। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং জিনিসটী অণ্ডাকার। কিন্তু পুরাণাদিতে দেখা

যায় যে, ব্রহ্মারও পূর্ব্বে কিছু ছিল। সৃষ্টির আদিতে দেখিতে পাই যে, চরাচর সমস্ত জলে পরিপূর্ণ, এবং তাহাতে মহাবিষ্ণু শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মহাবিষ্ণুর জন্ম একটা ডিম হইতে হইয়াছিল। সেই ডিম দেখিয়া তাহার মায়ের এত রাগ হইল যে, তিনি তাহাকে পদাঘাত করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। সেই খানে মহাবিষ্ণু ডিম হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার পিতা বাসুদেব আঙ্গুলে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া তাঁহাকে বাঁচাইলেন। মহাবিষ্ণু খুব ছোট খাটো লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেখা যায় যে তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ জলে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তাহাতে আবার এক এক জন বিরাট পুরুষ শয়ন করিয়াছিলেন। বিরাট পুরুষদের প্রত্যেকের নাভি হইতে এক এক পদ্ম বাহির হয়, সেই পদ্মের ভিতর হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। জন্মিয়াই ব্রহ্মার চিন্তা হইল যে, আমার এই শরীর কোথা হইতে আসিল? আমার পিতা মাতাই বা কোথায়? বন্ধুই বা কোথায়?

ব্রহ্মা সেই পদ্মের ভিতরে তিন লক্ষ দিব্য বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তার পর পাঁচ লক্ষ বৎসর তাহার বৃন্তে থাকিয়া বাসুদেবের আরাধনা করিলেন। তাঁহার নিকট মন্ত্র লাভ করিয়া ৭ লক্ষ বৎসর পদ্মের ভিতরে থাকিয়া তাহা জপ করিলেন। তার পর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বাসুদেব তাঁহাকে বর দিলেন।

অতঃপর এই ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ দেখা যাউক। অবশ্য ব্রহ্মাণ্ডের আকার উহা গোলাকার, তাই অণ্ড। দুইটী ও অবস্থান। কটাহ মুখোমুখী জুড়িলে যেমন একটা ফাঁপা গোলাকার খোল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ। ইহার ভিতরে ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহোর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক—এই সাতটী লোক আছে। ভূর্লোক আমাদের পৃথিবী। ইহার উপরে সূর্য্য অবধি ভুবর্লোক তাহার উপরে ধ্রুব অবধি স্বর্গলোক। তাহার উপরে আর গ্রহ নক্ষত্রাদি নাই। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরকার যে পরিধি, অথবা বেড়, তাহার নাম আকাশ-কক্ষা। তন্মধ্যে পরাবহ, পরিবহ, সুবহ, সম্বহ, উদ্বহ এই পঞ্চ বায়ু ক্রমে একটার নীচে আর একটী অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদিগের নীচে প্রবহ নামক বায়ু সর্ব্বদা পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহাতে শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতু, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহযুক্ত নক্ষত্রচক্র ঘুরিতেছে। সেই নক্ষত্রচক্র উত্তর ও দক্ষিণস্থিত ধ্রুব নামক তারাদ্বয়ে আবদ্ধ। তাহার নীচে "আবহ" নামক বায়ু সর্ব্বদা উত্তরমুখে প্রবাহিত। সেই বায়ুতে ক্রমান্বয়ে সিদ্ধগণ, তাহাদিগের নীচে বিদ্যাধরগণ, এবং তন্নিম্নে মেঘ ও বিদ্যুতের স্থান। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঈশ্বরের ধারণাশক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পৃথিবী শূন্যে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, নিতল, সুতল, বিতলাতল, ক্রমে এই সাত পাতাল। পৃথিবীর উত্তরে সুমেরু পর্ব্বত, তাহার উপরে একটী ধ্রুব তারা; এবং দক্ষিণে বড়বানল, তাহার উপরে আর একটী ধ্রুব তারা।

আমাদের শাস্ত্রে ধ্রুবতারার বড় সম্মান। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব তপস্যার দ্বারা বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এমন স্নেহাস্পদকে বিষ্ণু কি দিয়া পুরস্কৃত করিবেন! ধ্রুব চাহিলেন "আমাকে এমন কিছু দাও, যাহা আমার পিতাও পান নাই।" সুতরাং বিষ্ণু তাঁহাকে ধ্রুবনক্ষত্র করিয়া দিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, "অন্ন হইতে জীব হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, সেই বৃষ্টির কারণ সূর্য্য, সেই সূর্য্যের আধার ধ্রুব! তুমি আকল্প সেই পদে থাকিয়া জ্যোতিষ্কগণকে ঘুরাইতে থাক। আমি পূর্ব্বে মহাদেবকে আরাধনা করিয়া এই পদ পাইয়াছিলাম। কেহ চারি যুগ, কেহ মন্বন্তর এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তুমি এক কল্প থাকিবে। এমন পদ মনুও পান নাই। শাস্ত্রে আছে যে নক্ষত্রচক্র তৈলপীড় যন্ত্র, অর্থাৎ ঘানির ন্যায় ঘোরে। ধ্রুব অদ্যাপি সেই নক্ষত্রচক্রের ঘানি ঘুরাইতেছেন। পুণ্যের পুরস্কার যদি এইরূপ হয়, পাপের শাস্তি তবে না জানি কিরূপ। যাহা হউক, এই "কল্প" কথাটা লইয়া কিছু বলা আবশ্যক। কারণ শুনিতে পাই আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের নাকি ঐ পরিমাণ আয়ু।

ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু।

আমাদিগের তিন শত ষাট দিনে দেবতাদিগের এক দিন। ঐরূপ তিন শত ষাট দিনে তাঁহাদের এক বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,—এই চারি যুগে দেবতাদের বার হাজার বৎসর। এইরূপ সহস্র যুগে (কেহ কেহ বলেন দুই সহস্র যুগে) ব্রহ্মার একদিন। এইরূপ ত্রিশ দিনে তাঁহার এক মাস, এবং বার মাসে এক বৎসর।

এই হিসাবে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার নাকি এখন পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। তিনি একান্ন বৎসরে পা দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালটা তাঁহার জন্ম দিন। আর পঞ্চাশ বৎসর তিনি বাঁচিবেন। ব্রহ্মার একশত বৎসরে শ্রীহরির এক মুহূর্ত্ত। এইরূপ প্রত্যেক দিনে তিনি একটী করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং সংহার করেন। সুতরাং এক কল্পে ব্রহ্মার একদিন। আমাদের হিসাবে উহা অন্ততঃ এক শত আট কোটি বৎসর। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু। সৃষ্টির প্রণালী দেখিলাম; এখন সংহার অর্থাৎ প্রলয়ের ব্যাপারটা কিরূপ, একবার দেখা যাউক।

প্রলয়।

প্রথমে একশত বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি, তাহাতে অল্প-সার শস্যাদি শুকাইয়া যায়। সূর্য্যের রশ্মি সাতগুণ হইয়া যায়, এবং সাগরের জল পানে দীপ্ত হইয়া তাহা সাত সূর্য্যে পরিণত হয়। তাহারা পৃথিবীর তৃণবৃক্ষাদি ভস্মসাৎ করে। তারপর পাতাল, তারপর আকাশ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, নাগাদি সকলকে পোড়াইয়া সমস্ত লোক নিঃশেষ করে। তখন সমস্ত জগৎ জলন্ত ঘরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে। তারপর প্রলয়কালের ভয়ঙ্কর মেঘ সকল আকাশে দেখা দেয়। তাহাদের নানারূপ বর্ণ, নানাপ্রকারের ভয়ঙ্কর রূপ, এবং ঘোরতর গর্জ্জন। তাহারা হিমের ন্যায় জল বর্ষণ করিয়া আগুণ নির্ব্বাণ করে। আগুণ নিবিলে পর শত বৎসর জলবর্ষণ করিয়া, মহা জলধারায় ভুবন পরিপূর্ণ করে। পৃথিবী জলে আচ্ছন্ন হয়, পর্ব্বতসকল লোপ পায়। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হইলে, সেই ভয়ানক সমুদ্রে ব্রহ্মা যোগনিদ্রায় শয়ন করেন।

পুরাণে আছে যে,—মহাবিষ্ণুর যত লোমকূপ, ব্রহ্মা তত জন, এবং তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটী করিয়া ততগুলি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য।

ভারতীয় জ্যোতিষিক ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মাণ্ডের যেরূপ বর্ণনা দেওয়া গেল, সকল পুরাণে অবিকল ঐরূপ বর্ণনা না থাকিলেও, মূল বিষয়টা মোটা মুটি এইরূপ। এস্থলে একটা কথা এই দেখা যায় যে আমাদের দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরাও মোটামুটি এই মত মানিয়া লইয়াছেন। ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে অতিশয় সূক্ষ্মরূপে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা হইত। এবিষয়ের চর্চ্চায় হিন্দু জ্যোতিষিক-গণ এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে, দূরবীক্ষণ প্রভৃতির আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইউরোপ অঞ্চলে তেমন হয় নাই। পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে, জ্যোতির্ব্বিদেরা যে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সংবাদ রখিতেন তাহা ২ একটী বিষয়ের আলোচনা করিলেই জানা যাইতে পারে।

পৃথিবী যে গোল, একথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। এবং এরূপ হইলে তাহার উপরিস্থিত মনুষ্যাদির অবস্থা কিরূপ হয়, তাহারো সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।

যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীতলস্থ মাত্মান মস্যা উপরিস্থিতঞ্চ।
সমন্যতেহতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথশ্চতে তির্য্যগিবামনন্তি ॥
অধঃ শিরস্কা কুদলান্তরস্থা ছায়া মনুষ্যা ইব নীরতীরে।
অনাকুলাস্তির্য্যগধঃস্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তিতেতত্র বয়ংযথাত্র ॥

অর্থাৎ 'অবনীতলে যে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সে আপনাকে পৃথিবীর উপরিস্থিত বলিয়াই মনে করে। যাহাদের মধ্যে পৃথিবীর চতুর্থাংশ ব্যবধান, তাহারা পরস্পরকে তির্য্যকভাবে অবস্থিত মনে করে। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যাহারা আছে, তাহাদের মস্তক নীচের দিকে; জলে মানুষের ছায়া যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ। আমরা এখানে যেরূপ নিশ্চিন্ত রহিয়াছি, তির্য্যক এবং অধঃস্থিত লোকেরাও সেইরূপ নিশ্চিন্ত আছে।'

ভারি জিনিসকে ছাড়িয়া দিলে যে তাহা পৃথিবীতে

পড়ে, তাহা পৃথিবীর আকর্ষণবশতঃই হইয়া থাকে, একথা তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী যে ঘোরে, একথাও আমাদের জ্যোতির্ব্বিদদিগের কেহ কেহ বলিয়াছেন। তবে ইহা বলা উচিত যে, দেশের অধিকাংশ পণ্ডিত এ মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা ইহার খণ্ডনের চেষ্টা পাইয়াছেন। একটী যুক্তি এইরূপ ;—পৃথিবী যদি ঘোরে, তবে পাখী একবার বাসা হইতে উড়িলে তথায় ফিরিয়া আসে কিরূপে ? কারণ পাখী যতক্ষণ শূন্যে থাকে সেই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর ঘোরার দরুণ পাখীর বাসার অনেক দূরে চলিয়া যাওয়ার কথা। এইরূপ যুক্তি দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বড় বড় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই।

পৃথিবীর গতিতে কতকগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম আছে। একটী ব্যতিক্রম এইরূপ যে তাহাতে উহার মেরু (Pole) স্থানচ্যুত হইয়া অতিশয় ধীর গতিতে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। এই ঘূর্ণনের পরিমাণ ২৫ হাজার বৎসরে একবার। ইহার ফলে আকাশের ধ্রুবতারা ঠিক আকাশের মেরুতে অধিক দিন থাকিতে পারে না। এখন যাহাকে আমরা ধ্রুবতারা বলি, কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে তাহা ধ্রুবতারা ছিল না, তাহার প্রমাণ চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হোয়াংতি চীন দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ের চীন জ্যোতির্ব্বিদগণ বর্ত্তমান আল্‌ফা ড্রেকোনিস নামক তারাকে ধ্রুব-তারা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ের প্রমাণ মিশর দেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া যায়। এই ব্যাপারকে আজ কাল জ্যোতিষ শাস্ত্রে "Precession of the equinoxes" বলা হয়। এই ব্যাপারটিকে ইউরোপীয়দিগের অনেক পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাকে তাঁহারা বলিতেন "অয়ন চলন"।

জ্যোতির্ব্বিদ্যার এতদূর উন্নতি সত্ত্বেও যে প্রাচীন কালের জ্যোতির্ব্বিদেরা পৌরাণিক মতের এত সম্মান করিতেন, তাহার একটা কারণ দেখা যায়। গণিত এবং যুক্তির সাহায্যে যতদূর জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কালে চোখে দেখিয়া এ সকল বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় ছিল না। সুতরাং সে স্থলে পৌরাণিক মত গ্রহণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া এই প্রাচীন পৌরাণিক মত লইয়া আরম্ভ করা ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নাই। কারণ, আমরা যত রূপ মতের কথা জানিয়াছি, তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং অন্যান্য মতে ইহার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা দেখিবার বিষয় তাহাকে কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে বর্ণন করিতে গেলে যেরূপ হইতে পারে, এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। আকাশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কারণ তাহা বহু দূরের বিষয়। এই পৃথিবীর উপরিভাগের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাতেও দেখা যায় যে সত্যের ভাগ অতি অল্প, কল্পনাই অধিক। এরূপ স্থলে এ মতের কতদূর সম্মানযোগ্য, কতটুকু অগ্রাহ্য, তাহা স্থির করা কঠিন বোধ হয়। অনেক সময় পৌরাণিক কল্পনার মধ্যে অতিশয় মূল্যবান সত্য থাকে। কিন্তু কল্পনার মুখোস পরিয়া সেই সত্য এরূপ বিকট রূপ ধারণ করে, যে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করাই তখন বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বোধ হয়।

প্রাচীন কালের আর্য্যদের ইতিহাসঘটিত অনেক সুন্দর জ্যোতিষিক তত্ত্ব এই সকল পুরাণের ভিতরে রূপকের আকারে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ কালকার দেশীয় এবং বিদেশীয় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতগণ, অনেক স্থলে, এই সকল তত্ত্বকে রূপকের আবর্জ্জনা হইতে বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুরাণের ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনার ভিতরে এইরূপ তত্ত্ব, অথবা অন্য কোনরূপ মূল্যবান সত্য কি পরিমাণে আছে, বলিতে পারি না। সাধারণ ভাবে ইহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলে, কয়েকটী বিষয় অনুধাবনযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

প্রথমে একটা কথা এই দেখা যায় যে, সৃষ্টি যে

দেশ কাল বিষয়ে অনন্ত, এবং এই পরিদৃশ্যমান জগত যে তাহার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীহরির প্রতি মুহূর্ত্তে ব্রহ্মার উত্থান পতন হইতেছে। ব্রহ্মার প্রতিদিনে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি,—এইরূপ অনন্তকাল চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং কালের সম্বন্ধে অনন্তত্ব সুন্দররূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ বিষয়ে অনন্তত্বও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলাতে, পরিষ্কারই বুঝান হইয়াছে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, ভগবানের শক্তি যখন অনন্ত, তাঁহার সৃষ্টি যে অনন্ত হইবে, একথা ত সহজেই বোঝা যায়। সৃষ্টির অনন্তত্ব সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য অতিশয় সঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু অনন্তত্ব অপেক্ষা, ঐ অনন্তত্ব যে উপায়ে সূচিত হইয়াছে, সেই উপায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মাণ্ডের যেমন বার বার ধ্বংসের কল্পনা করা হইয়াছে, আধুনিক জ্যোতিষেতেও সেইরূপ জ্যোতিষ্কগণের ধ্বংস এবং নূতন জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি স্বীকার করা হয়। প্রভেদ এই যে, পুরাণে যেমন এককালীন ধ্বংসের ও এককালীন সৃষ্টির কথা দেখা যায়, বর্ত্তমান বিজ্ঞান তাহার সমর্থন করেন না। সৃষ্টি এবং ধ্বংস আমাদের চোখের সাম্‌নেই চলিতেছে। হঠাৎ একবার সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া আবার নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হইবে, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আর এই পরিদৃশ্যমান জগত যে অসীম নহে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন।

পুরাণেতে, ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ অংশ কত বড়, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এসকল কথা ঠিক বিজ্ঞানসঙ্গত হইবে, এরূপ আশা করা অন্যায়। তথাপি দেখা যায় যে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপে এসকল বিষয়ে যেরূপ ধারণা ছিল, পৌরানিক মত তাহা অপেক্ষা অনেক সঙ্গত। মঁগলফিয়ে যখন বেলুন আবিষ্কার করিলেন, তখন ইউরোপের অনেকে নাকি মনে করিয়াছিলেন যে অতঃপর বেলুনে চড়িয়া চন্দ্রমণ্ডলে বেড়াইতে যাওয়া যাইবে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা অন্ততঃ একথা মনে করিতেন যে, গ্রহ নক্ষত্রাদি আমাদের এত কাছে নহে।

নক্ষত্রাদির অবস্থিতির সীমা তাঁহারা ৮ কোটি মাইল বলিয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী বলেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের এই সাক্ষ্য ইউরোপের পণ্ডিতেরা প্রথম মানিতে চাহেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্রহ্মাণ্ড দুইটী কটাহের যোগে উৎপন্ন ভাণ্ডবিশেষের ন্যায়। এই ভাণ্ডের ভিতরকার বেড় কত, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে তাহার একটা অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক জ্যোতিষগ্রন্থে, প্রাচীন পণ্ডিতগণের দোহাই দিয়া, এই অঙ্কের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "কেহ বলেন উহা ব্রহ্মাণ্ডকটাহের বেষ্টন, কেহ বলেন উহা লোকালোক পর্ব্বতের পরিমাণ, কেহ বলেন যে, সূর্য্যের আলোকেতে আকাশের যতটুকু আলোকিত হয়, ইহা তাহার পরিধি।" ব্রহ্মাণ্ড এত বড় কি না জানি না, তবে আমাদের মত এই যে, এক কল্পে সূর্য্য যতদূর যান, প্রাচীন পণ্ডিতগণ এখানে তাহাই বলিয়াছেন। কোন্ জিনিসের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই যখন ঠিক নাই, (বিশেষতঃ সেই সকল জিনিসের স্বরূপ এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন এরূপ ভ্রান্ত সংস্কার) তখন অঙ্কটার মূল্য অনেক খানি কমিয়া যাইতেছে। তথাপি এই অঙ্ক হইতে ইহা প্রমাণ হয় যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে অতিশয় উদার ধারণা ছিল। সেই অঙ্কটী এই। ১৮ অন্ত্য, ৭১ পদ্ম, ২০ নিখর্ব্ব, ৬৯ বৃন্দ, ২০ কোটি যোজন। ইহা হইতে মাইলের অঙ্কে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্দ্ধ বাহির করিলে, ২৩ অন্ত্য, ৮১ পদ্ম, ৫৩ নিখর্ব্ব, ৬০ বৃন্দ, ৮০ কোটি হয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবী হইতে আল্‌ফা

সেণ্টরী (Alpha centauri) নামক আমাদের নিকটতম তারাটীর দূরত্ব ২ পদ্ম, ৬৪ নিখর্ব্ব, ৯০ বৃন্দ, ১৩ কোটি, ৬৯ লক্ষ, ৩২ হাজার মাইল। পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ৯— ... ৬৬ ক্যাসার্দ্ধ ইহার সহস্রগুণের কাছাকাছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরের স্থান, বর্ত্তমান কালের হিসাবেও নিতান্ত কম ছিল না।

পুরাণে সৃষ্টির পূর্ব্বে জলের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে বর্ত্তমান কালের নীহারিকাবাদও (নেবুলার থিয়রি) পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের মধ্যে আছে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

এরি মধ্যে।

হে দেব, প্রভাত নব যায় নি এখনো,
এখনো অর্দ্ধেক বাকী পূজা সমাপন,
সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি হয় নাই শেষ,
তবে কেন এরি মধ্যে যাত্রা আয়োজন?
সাহানার সুরখানি অর্দ্ধ উচ্চারিত,
ফুটমালাখানি আছে করিতে অর্পিত,
প্রার্থনার মন্ত্রগুলি ওচরণ তলে
এখনো ত হয় নাই পূর্ণ নিবেদিত।
মঙ্গল বরণকাল আগত এখন,
নৈবেদ্যের পূতপুষ্প সদ্য আহরিত,
নব ধূপ ধূনা রাশি সবে ও অঙ্গনে
জ্বলিছে; হয় নি শেষ প্রভাতী সঙ্গীত;
বিপুল পূজার এযে সবে আরম্ভন,
এরি মধ্যে কেন তবে যাত্রা আয়োজন?

লজ্জাবতী বসু।

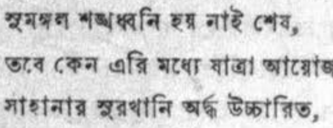

আত্মহত্যা না খুন?

(একটি ইংরাজী ... ... বাঙ্গালা অনু)

(১)

যুগল মিলন।

সকলেরই বিশ্বাস পরস্পর বিভিন্ন গুণাবলম্বী যুগলের মধ্যে শীঘ্রই বন্ধুতা জন্মে; কেন না, একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। টম্ ও মটের মধ্যে এক গৃহে শয়ন উপবেশন ছাড়া আর কোন সাদৃশ্যই ছিল না, অথচ উভয়ের মধ্যে একাত্ম্য ভাব। উভয়ের বৈসাদৃশ্য নামে আরম্ভ, শেষ কোথায়ও নাই। মট্ ব্যাঙ্কের বড় বাবু; টমের বিষয়কর্ম্মটা লোকের তেমন হৃদ্গম্যই হয় না;—তিনি সংবাদপত্রে লেখেন আর ডিবেটিং ক্লাবে সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধীয় বিষয় সকলের পক্ষ সমর্থন করেন। মট্ দেখিতে সুপুরুষ, গোঁফ দাড়িতে মুখ পরিপূর্ণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সোজা, লম্বা। টম্ নিতান্ত অপরিষ্কার, মুখে গোঁফ দাড়ির রেখা মাত্রও থাকিবার যো নাই, ঘাড় বাঁকা, সোজা দাঁড়াইতে অক্ষম। যতক্ষণ ঘরে থাকেন, টম্ মাটির পাইপে চুরুট খাইয়া ও একটু একটু হুইস্কি পান করিয়াই সময় কাটান, মট্ চুরুটের নামও শুনিতে পারেন না। এবং আহারের সময় এক গ্লাস ক্ল্যারেট্ ছাড়া মদ্য স্পর্শও করেন না।

তাঁহাদের উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র ও রুচি এরূপ বিভিন্ন ছিল, যে তাঁহাদিগকে বেশী সময় এক সঙ্গে কাটাইতে হইত না। তবে দু একটী বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত ছিল—তাঁহারা দুই জনে এক সঙ্গে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতেন এবং রাত্রে কেহ বাহিরে থাকিতেন না। তার পর টমের সংবাদ-পত্রের মহল ও সভা-সমিতি; ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মটের নিকট সহর ও সহরতলির সকল ভদ্রলোকের বাড়ীই অবারিত। তিনি সহরতলির অবসর প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যশালী বিপত্নীক বণিক উইলসন সাহেবের একমাত্র সুন্দরী কন্যা মেরীর পরিণয়প্রার্থী। কেবল প্রার্থী নহেন, সম্বন্ধ একরূপ পাকাপাকি হইয়া আসিয়াছে।

মটের অনেক সময় মেরীর সংসর্গেই কাটিয়া যায়। তত-ক্ষণ টম্ গৃহে বসিয়া চুরুট ফুকেন। টমের উপর গৃহস্বামিনীর [illegible] একটা শ্রদ্ধার ভাব নাই, কেন না টম্ তেমন [illegible] বাবুও নয় এবং কাজ কর্ম্মের জন্য চাকর বাকরের উপর ডাক হাকও কম। এক কথায় তাঁহার জন্য খাটিতে হয় কম এবং যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট। টমই দুই জনের জন্য বাড়ী ভাড়া নেয়। নিতান্ত গোবেচারী লোক। শয়ন গৃহ হইতে টেমস্ নদীর দৃশ্য নয়ন গোচর হয়, এই প্রলোভন দেখাইয়া টমের সঙ্গে বাড়ীওয়ালি ঘরের ভাড়া প্রায় দেড়গুণ নির্দ্দিষ্ট করে। কিন্তু পরদিন যখন মট্ আসিয়া খুটি নাটি ধরিয়া ঘরের নানারূপ দোষ বাহির করিয়া দিলেন তখন বাড়ীওয়ালি ঘরের ভাড়া কমাইতে বাধ্য হইল। মটের খুটি নাটি সকল বিষয়েই চলিতে লাগিল। আজ জুতোটা তেমন ভাল ব্রাস হয় নাই, কাল জামার কফ্টা তেমন দুরস্ত হয় নাই, পরশু মুখ ধোওয়ার জলটা বেশী গরম হইয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু টমের মুখে বাক্য নাই—তাঁহার চকচকে জুতারও দরকার হয় না এবং জামার নরম আস্তিনেও আপত্তি নাই। সুতরাং বাড়ীওয়ালির শ্রদ্ধাও কখন আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। তিনি রবিবার গির্জ্জায় যান না। মট্ গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে টম্ তখনও শয্যা পরিত্যাগ করেন নাই। অনেক বকাবকি করার পর তিনি গাত্রো-থান করেন। এমন কি, কোন কোন রবিবারে শয্যাত্যাগ করিতে টমের এত দেরী হয় যে মট্ একাকীই ভোজন করিবেন বলিয়া তাহাকে ভয় দেখান। কিন্তু অন্যবারে টম্ সুদে আসলে ইহার প্রতিশোধ তুলেন। তিনি এত প্রত্যূষে উঠিয়া ক্ষৌর কার্য্যের জল মাগেন, যে অপক্ক নিদ্রোত্থিতা ঝি তখন বগ্ বগ্ করিতে করিতে রন্ধনশালা হইতে আসিয়া সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া দেয়। প্রত্যহ স্বহস্তে দাড়ী গোঁফ না কামাইলে টমের চলে না।

(২)

পরিচয়-বিভ্রাট।

এই ঘর ভাড়া লইবার দশ দিন পরে এক রবিবার বৈকালে মেরী মটের বাড়ীতে চাএর নিমন্ত্রণে উপস্থিত। অক্টোবরের মধ্যভাগ, আকাশ পরিষ্কার ও নীল। অত্যন্ত গরম। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! মট্ ঘরে নাই। মেরীর মন-স্তুষ্টি সাধনে মট্ সর্ব্বদা এতটা মনোযোগী ও ব্যস্ত যে তিনি [illegible] পাইলেন না। মটের অনুপস্থিতির কোনই অর্থ খুঁজিয়া [illegible] মট্ যে মেরীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা কি তিনি ভুলিয়া গেলেন? ঝির সঙ্গে মেরীর প্রশ্নোত্তর শুনিয়া স্বীয় কদর্য্যবেশে চুরুট ফুকিতে ফুকিতে টম বাহিরে আসিয়া খবর দিলেন যে মট্ বৈকালে হঠাৎ কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। মেরী থত মত খাইয়া বলিলেন "বাহিরে গি—য়া—ছেন। কিন্তু তিনি যে আমাকে চাএর নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন"। তখন টম্ বলিলেন—"আপনি বুঝি কুমারী উইলসন্"?

"হাঁ, আমি কুমারী উইলসন্"।

"মট্ আমাকে আপনার বিষয়ে অনেক কথা বলিয়া ছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার নির্ব্বাচনের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিবার অবসর পাই নাই"।

এই প্রশংসায় মেরীর মুখ লাল হইয়া উঠিল এবং কেন যেন সহজভাবেই টমের উপর তাঁহার অবিশ্বাস উৎপন্ন হইল। তাঁহার গম্ভীর গলার আওয়াজ যেন মেরীর মনে কেমন ভীতি উৎপাদন করিল। তারপর সেই অভদ্রতা-ব্যঞ্জক মাটীর পাইপে চুরুট ফুকা। যাহা হউক, প্রত্যুত্তরে মেরী বলিলেন:—

"ওঃ, আপনি বুঝি টম্ পিটার্স, মট্ রুফডেল্ আপনার কথা অনেক সময়ে বলেন।" টম্ হাসিয়া বলিলেন—"তিনি নিশ্চয়ই আমার যত দোষের কথা বলিয়াছেন। সেই জন্যই বোধ হয় আমার পোষাক দেখিয়া আপনি আশ্চর্য্য হন নাই।" মুক্তাসদৃশ দন্তপাতি বাহির করিয়া মেরী একটু হাসিলেন এবং বলিলেন—"মট্ আপনাকে সর্ব্বগুণের আধার বলিয়া বর্ণনা করেন"। টম্ একটু উচ্চস্বরে বলিলেন—"ইহাতেই তো বন্ধুত্বের পরিচয়! আপনি একটু ভিতরে আসুন না, মট্ এই মুহূর্ত্তেই ফিরিয়া আসিবেন। তিনি আপনার সঙ্গে কখনও কথা ভঙ্গ করিবেন না।" মেরী ঘাড় নাড়িলেন। মটের উপর অভিমান করিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সুতরাং মনে করিলেন যে রাগ

করিয়া ফিরিয়া গেলেই তাঁহার যথেষ্ট শাস্তি হইবে। টম্ বলিলেন "আপনাকে এক পেয়ালা চা দেবার অনুমতি করুন। যে গরম, আপনি নিশ্চয়ই খুব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছেন। আর আপনি যদি এখন গৃহাভ্যন্তরে আসেন তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে মুহূর্ত্তে মট্ ফিরিয়া আসিবেন, আমি বাহিরে চলিয়া যাইব, আপনাদের প্রেমালাপের অন্তরায় হইব না।" মেরী টমের সঙ্গ আদৌ পসন্দ করিতেছিলেন না, তার পর মটের উপর যে তাঁহার অভিমান তাহাও পরিত্যাগ করিতে রাজী নহেন। সুতরাং টম্ বিনীত ভাবে বলিলেন—"আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিলে মট্ আসিয়া আমাকে অত্যন্ত গালাগালি করিবেন। অন্ততঃ আমাকে বলিয়া যান, তিনি আপনাকে কোথায় খুঁজিবেন।" "আমি চেয়ারিং ক্রশে বাসে (omnibus) চড়িয়া সোজা বাড়ী চলিয়া যাইব"; এই কথা বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মেরী হন্ হন্ করিয়া রাস্তা পার হইয়া চলিয়া গেলেন। সমস্ত ঘটনার উপরে যেন একখণ্ড কাল মেঘের আবরণ পড়িয়া রহিল। কিন্তু যেই মেরী অম্নিবাসে চড়িতে যাইতেছেন অমনি একখানা হান্সম্ (hansom) গাড়ী ছুটিয়া আসিল এবং তাহার মধ্য হইতে একটী সুপরিচিত স্বর তাঁহাকে আহ্বান করিল। গাড়ী থামিল এবং মট্ বাহির হইয়া আসিয়া মেরীর দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—

"ভাগ্যিস্ তোমার একটু দেরী হয়েছে। নিতান্ত দায়ে প'ড়ে একটু বেরুতে হয়েছিল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সময় মত ফেরবার চেষ্টা কর্‌ছিলুম্। যদি তুমি সময়ে আস্‌তে আমাকে ঘরে পেতে না।" তার পর একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন—"তবে আমার একমাত্র ভরসা ছিল, তুমি মেয়ে মানুষ তো বটে। কেমন ঠিক্ নয় কি?" মেরী একটু রাগত ভাবে বলিলেন, "আমি ঠিক সময়ে আসিয়াছিলাম। তুমি যে মনে করিতেছ আমি গাড়ি হইতে নামিতেছি, তাহা নহে; আমি ফিরিয়া বাড়ী যাইতেছি।" শুনিয়া মটের মুখ শুকাইল। সে হাসিমুখ মলিন হইল দেখিয়া মেরীর মন ভিজিল। মট্ বোতামের ঘর হইতে সুন্দর গোলাপ ফুলটি আস্তে আস্তে খুলিয়া মেরীর হস্তে প্রদান করিলেন। গাড়ী মটের বাড়ীর দিকে ছুটিল। গাড়ীতে মেরী ও মট্। মেরী যখন আদর করিতে করিতে মটের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল তখন মট্ সুযোগ বুঝিয়া অভিমানের ভাবে মেরীকে বলিলেন, "তোমার হৃদয় কি কঠিন, মনে ক'রে দেখ যখন গৃহে ফিরিয়া আমি দেখিতাম তুমি চলিয়া গিয়াছ, [illegible] তখন আমার কি কষ্ট হ'ত? একটুও কি অপেক্ষা কর্‌তে নাই?" তখন মেরীর অভিমান নিঃশেষে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং উত্তর করিলেন, "তোমার সেই টমের সঙ্গে নাকি? লোকটার সব বেয়াড়া রকমের।" মেরীর কথা শেষ হইতে না হইতেই মট্ প্রতিধ্বনি করিলেন, "সেই টমের সঙ্গে নাকি?—কেন টমের কি হয়েছে?"

"জানি না কেন, তাঁর সঙ্গ আমার একটুও ভাল-লাগিল না"।

"না মেরী, তা হবে না। টম্‌কে তোমায় ভাল-বাস্‌তেই হবে। সে আমার আজন্ম বন্ধু। অন্ততঃ আমার খাতিরে তাঁকে ভালবাস্‌বে।"

"আচ্ছা, চেষ্টা কর্‌ব", বলিয়া মেরী নীরব হইলেন। মট্ বলিলেন, "আজ চায়ের সময়ে তুমি তাঁর প্রতি বন্ধুভাবে ব্যবহার করবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অবন্ধুভাব আমি আদবেই পসন্দ করিব না।

"আমি কাহারও অবন্ধু হইতে ইচ্ছা করি না, তবে কি না তাঁহাকে দেখা মাত্রেই তাঁহার উপর কেন যেন একটা অবিশ্বাস জন্মিল", মেরী এই কথা বলিতে না বলিতেই গাড়ী দরজায় থামিল এবং মট্ শশব্যস্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া টম্‌কে ডাকিলেন। কিন্তু টম্ ঘরে নাই। তখন দুঃখিত হইয়া মট্ মেরীকে বলিলেন, "দেখ তোমারই দোষে টম্ আমাকে খুঁজিতে বেরিয়েছে"। মেরী বলিল, "বোধ হয় তা নয়। আমি আবার ফিরে আস্‌ব জেনেই তিনি আমাদের জন্য ঘর খালি করে পালিয়েছেন। আমার কাছে তিনি এইরূপ প্রস্তাব করেছিলেন।"

"তবুও তুমি বল্‌ছ তাঁকে পসন্দ কর না!"

মেরী অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসিল। কিন্তু টমের অনুপস্থিতিতে মনে মনে বেশ আহ্লাদিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

আদর্শ দাম্পত্য জীবন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—বাঁকিপুরে প্রথম বার।

আমার বাঁকিপুরে আগমনের প্রায় এক বৎসর পরে আবার মতিহারীর উৎসব উপস্থিত হইল। সুবোধচন্দ্র তখনও ভুগিতেছেন। উৎসবও থাকা হইবে, ও বায়ু পরিবর্ত্তন হইবে, এইজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উঁহাকে লইয়া মতিহারী চলিলাম। সেথানে গিয়া প্রথম প্রথম উঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল। একমাত্র পুত্র সন্তান অতি আদরের ধন; মনে হইল তাঁহাকে বুঝি বাঁচাইতে পারা যাইবে না। একদিন নাড়ী আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। আমি তোমাকে ডাকিয়া আনিয়া তোমার সঙ্গে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তোমার ধৈর্য্য ও নির্ভর আমা অপেক্ষা অধিক। এমন স্থিরচিত্তে, তত্ত্বজ্ঞানীর মত কথা কহিলে যে শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। বুঝিলাম, আমরা দুজনে ভগবানের সকল বিধিকেই চিরদিন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারিব।

চিকিৎসা করিতে করিতে ক্রমে সুবোধ ভাল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তুমি শয্যাগত হইলে। চিকিৎসক বলিলেন উদরে গুল্ম হইয়াছে। অতি কষ্টে তোমাকে মতিহারী হইতে বাঁকিপুরে ফিরিয়া আনিলাম। বাঁকিপুরের ডাক্তারেরা কলিকাতায় লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। কলিকাতার কয়েকজন ডাক্তারের চিকিৎসার পর কবিরাজ দেখান হইল। * * কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিকিৎসা হইতে লাগিল। * * তিনি বলিলেন রোগ 'অষ্ঠীলা', আরোগ্য হইবার নহে। * * তখনকার আমার মনের অবস্থা তুমিই বুঝিতে পারিবে। এদিকে আমার ছুটী ফুরাইল, * * আমি যেদিন বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাইব তাহার পূর্ব্ব রাত্রে তুমি আমি দুইজনেই ক্রন্দন করিলাম। এজীবনে এমন ক্রন্দন করিয়াছি কি না মনে নাই। * * অবশেষে সুবিজ্ঞ ডাক্তার চার্লস্ সাহেব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোনও রোগ নয় উদরে ছয় মাসের সন্তান আছে। ** শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় তখন বাঁকিপুরে মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবী তোমাকে তাঁহার বাটীতে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ১৮৭৯ সালের শেষে বাঁকিপুরে প্রত্যাগমন করিলে ও সৌদামিনী দেবীর সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলে। [illegible] বৎসর কাল তোমরা একত্রে ছিলে। কোন দুই বঙ্গনারীর মধ্যে এমন সদ্ভাব আমি দেখি নাই। ** একটী মাত্র ঘরে তোমার ভাঁড়ার শয়ন, উপাসনা সকলই হইত। কিন্তু তুমি বড়ই সুখে থাকিতে। এক দিন আমি সীতামাঢ়ি গিয়াছি, এমন সময়ে তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। ** ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে আমরা সকলেই তৃপ্ত হইলাম। সমুদয় আশঙ্কা চলিয়া গেল।

মতিহারী থাকিতেই তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিতে শিখিতেছিলে, কিন্তু জীবন শুধু ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করা যায় না। বাহিরের জগৎ দেখিয়া মনের যে প্রসার হয়, ভাল লোকদের সঙ্গে মিশিয়া আত্মার যে উন্নতি হয়, সে উন্নতি ও সে প্রসার বিনা ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন হয় না। তাই এই সময় হইতে আমাদের চেষ্টা হইল, কিসে আমাদের জীবন আপন সংসারের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তুমি এতদিন গ্রামের পুরনারীর মতন গৃহেই আবদ্ধ ছিলে। তোমাকে ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে আনা আমার একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইল। যখন তোমাকে আমার বন্ধুদের সঙ্গে, গুরুজনের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলাম, তখন তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমারও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। আমি বুঝিলাম তোমাতে এমন কোন বস্তু আছে, যাহা অনন্ত উন্নতি চায়। আর দেখিলাম, অতি সত্বর তুমি নারীসুলভ লজ্জা ও ভয় অতিক্রম করিয়া আসিলে। তোমার সাহস দেখিয়া, লোকের সঙ্গে মিশিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতে লাগিলাম। তোমার গুণে আমার বন্ধুর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই দৈনিক উপাসনার ভাব উন্নত হইতে লাগিল, সহানুভূতির শক্তি বাড়িতে লাগিল, এবং সংযমের পথও সহজ হইতে লাগিল।

এই সময়ে দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়দিগের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় হইল। তাঁহাদের সঙ্গে এবং অন্যান্য ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে উপাসনা করিয়া আমরা অনেক উপকৃত হইয়াছিলাম। দেবী সৌদামিনীর সঙ্গে তুমি কখনও কখনও বেড়াইতে যাইতে লাগিলে। একদিন আমাদের ইচ্ছা হইল, ডুমরাওনের বনটীতে গিয়া উপাসনা করিব। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ঐ বনে সদলে উপাসনা করিয়াছিলেন। ষ্টেসনে নামিয়া দেখি, একা ভিন্ন অন্য যান নাই, সুতরাং তোমাকে একা করিয়া যাইতে হইল। এই তুমি প্রথম একায় চড়িলে। একায় প্রথমবার চড়িবার সময় যে লজ্জা ও ভয় করে, তাহা তুমি অতি সহজেই অতিক্রম করিলে।

যতই তুমি বাহিরের জগৎ দেখিতে লাগিলে, ততই বুঝিতে পারিলে, এদেশে নারীর অবস্থা কত হীন, এবং তাহার উন্নতির পথে পদে পদে কত বাধা। ১৮৮১ সালে তুমি যখন গয়াতে গিয়াছিলে, সেখানকার উৎসবে যোগ দিয়া, সকলের উৎসাহ ও প্রমত্ত ভাব দেখিয়া নারীদিগের জন্য তোমার এই বেদনা আরও জাগিয়া উঠিল। উৎসবান্তে যখন সকলে শ্যামাচরণ বাবুর বাটীর প্রাঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন তুমি আর থাকিতে পারিলে না। তুমি দেখিলে, কেবল পুরুষেরাই সমবেতভাবে হরিগুন কীর্ত্তন করেন। নারীদের ভাগ্যে তাহা হয় না। তুমি তখন উপরের বারেন্দা হইতে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলে, "ভগবান্, তোমার পুত্র-সন্তানদের জন্য এত করিলে, ভালই হইল; তোমার কন্যাদের জন্য কি করিলে? তাহাদের মুখপানে কে চাহিবে? তাহাদের উন্নতি কিরূপে হইবে?" তোমার এই করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অবধি শ্রদ্ধেয় প্রচারক কেদার বাবু মহাশয় তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতেন ও তোমার নিকট থাকিতে পাইলে বড়ই সুখী হইতেন। সাধু অঘোরনাথও গয়ার সেই দলে ছিলেন। তিনি গয়ায় থাকিতেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ সংবাদ পাইলেন। তিনি বলিলেন, বাঁকিপুরে তোমার বাটিতে মাতৃশ্রাদ্ধ করিবেন। তাঁহার এই আত্মীয়তা স্বীকারে আমরা কতই কৃতার্থ অনুভব করিলাম। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্দ্দ অনুসারে শ্রাদ্ধের সব কায কর্ম্ম তুমি সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন করিলে।

এই বৎসর ১লা জুন হইতে বাড়ীতে একটি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন হইল। তুমি প্রতিমাসে স্বামীর বেতনের টাকা অগ্রে গৃহদেবালয়ে ঈশ্বরচরণে নিবেদন করিয়া তাহার পরে ব্যয় করিতে লাগিলে। বালকবালিকা সকলেই বুঝিতে লাগিল যে ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত একটি পয়সাও ব্যয় করিতে নাই।

কিছুদিন পরে আমার কনিষ্ঠ প্রবোধ তাঁহার পরিবার লইয়া বাঁকিপুরে উপস্থিত হইলেন। এত গুলি পরিবার লইয়া দেবী সৌদামিনীদের সঙ্গে একত্রে থাকিলে তাঁহার অসুবিধার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহাদের ভালবাসা অতিক্রম করা কঠিন বলিয়া আরো কিছুদিন থাকিতে হইল। ১৮৮১ সালের শেষভাগে অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। আবার তোমার গৃহিণীর কার্য্য আরম্ভ হইল। এইবার দেখিলাম, তুমি কেমন সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহকর্ম্ম করিতে পার, আবার কত যত্নের সহিত দৈনিক ধর্ম্ম সাধনটুকুও ধরিয়া থাক। একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু পীড়িত হইয়া এই সময়ে কয়েকদিন আমাদের বাটীতে ছিলেন। তোমার সেবা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। উপাসনার সময় তোমাকে মা ভগবতী বলিলেন, কন্যা দুটিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বলিলেন, পুত্র দুটিকে কার্ত্তিক ও গণেশ আখ্যা দিলেন। এত প্রশংসা আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু তুমি তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাব জাগাইয়া দিয়াছিলে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি চলিয়া গেলে তোমার অপূর্ণতার বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করিলাম; কারণ কেবল প্রশংসা লাভ করিলে মানুষের ক্ষতি হয়।

একদিন সকালে আমার উপাসনা ভাল হয় নাই। মন অশান্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তুমি অনুরোধ করিলে, আবার উপাসনা হউক। ইহার পূর্ব্বেই বাড়ীতে

পৃথক উপাসনার ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেদিন তোমার সেই অনুরোধের ফল কি হইয়াছিল, তাহা আমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। "উপাসনা সরস হইল না। সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর অনুরোধে উপাসনা ঘরে বসিলাম, ও মহা উপকার পাইলাম। প্রাণ ভিজিয়া গেল।" এরূপ না হইলে কি সংসারে চলিতে পারিতাম? এইরূপ তুমি যে আমাকে কত দিন আধ্যাত্মিক কত বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। আমার মন শুষ্ক হইলে তুমি আমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতে, ও কিসে সে শুষ্কতা যায় তাহার চেষ্টা করিতে।

১ লা জুলাই, ১৮৮২, তোমার তৃতীয় পুত্র বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়। তখন তোমার বয়স ২৬ বৎসর। এই আমাদের শেষ সন্তান। অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হয় তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে। সমাজে যাইতে হইলে সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া দাসীর নিকট রাখিয়া যাইতে; কিন্তু অতি শিশু সন্তানকে তো রাখিয়া যাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে গর্ভস্থ সন্তান সাধনের আরও ব্যাঘাত করে, এ কথা সদাই বলিতে। এইবার তাই আমরা দুজনে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর সন্তান হইবে না। কিছুকাল পরে যখন এই সন্তানের নামকরণ উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রচারক মহাশয় আসিলেন, তখন তাঁর সম্মুখে আমরা দুজনে ছয় মাসের জন্য আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই ছয় মাস শরীরের সম্পর্ক থাকিবে না। সন্তানের মাথায় হাত দিয়া এ প্রতিজ্ঞা শক্ত করা হইল। কত ভয়ে ভয়ে তখন এই ব্রত গ্রহণ করিতেছিলাম! কিন্তু ভগবান সহায় হইয়া দেখাইয়া দিলেন, তিনি দুর্ব্বল মানুষের দ্বারা কি আশ্চর্য্য কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন।

এই ছয় মাসের পাঁচ মাস অতীত হইলে মাঘ মাস উপস্থিত হইল। আমরা কলিকাতায় উৎসবে যাইব স্থির হইল। * * তুমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলে। বাসা লইলে। কয়েক দিন পরে আমিও আসিয়া জুটিলাম। * *

তুমি স্বীয় শৃঙ্খলাগুণে সন্তানাদির আহার সমাপন করিয়া প্রতিদিন সকাল বেলা ৮টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া আচার্য্যগৃহে * দৈনিক উপাসনাস্থানে চলিয়া যাইতে। অনেকদিন তোমাকে চেষ্টা করিয়া প্রবেশদ্বার খোলাইয়া লইতে হইত; অনেকদিন ভাল স্থান পাইতে না; তবু তোমার উপাসনার অনুরাগ কমে নাই। তোমার অনুরাগ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন। আচার্য্য বলিয়াছিলেন, "নূতন যে মেয়েটী আসিয়াছে, তাহার কাছে তোমরা উপাসনায় অনুরাগ শিক্ষা কর।" উপাসনার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে। কেহ কেহ নাম পাঠের সময় উপাসনায় যোগ দিতে আসিতেন; ইহা দেখিয়া তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। উৎসবের পূর্ব্বে নববৃন্দাবন নাটক দেখিয়া সুখী হইয়াছিলে। তোমার নাটক দেখা এই প্রথম এবং এই শেষ।

আত্মিক মিলন ব্রতের ছয় মাস উৎসবের মধ্যেই শেষ হইল। এই শেষ দিনের জন্য তুমি প্রতীক্ষা করিতেছিলে, আমিও প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। দেব-প্রেরণায় এই দিন সকালের উপাসনার পরে আমরা দুজনে সঙ্কল্প করিলাম, এই ব্রতই আজীবন পালন করিব। অনন্ত আত্মিক মিলনের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলাম। উৎসবের প্রবাহে থাকিয়া তখন আমরা এই ব্রত গ্রহণের জন্য কিছুই ক্লেশ অনুভব করিলাম না।

ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবের দিন তুমি দুই বার প্রার্থনা করিয়াছিলে। প্রার্থনার বেগ আসিলে প্রার্থনা করিতে দেশকাল তোমায় কোন বাধা দিতে পারিত না। এক উপাসনায় একজনের দুইবার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অনেকে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে বিদায়ের সময় আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে। প্রণাম করিয়া তুমি বলিলে, "ভুলিবেন না!" আচার্য্য বলিলেন, "আর কি ভোলা যায়!" নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে ভোলেন নাই; কেন না তাঁহার ভাবে, তাঁহার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কায করিয়াছিলে। তাঁহার মত তোমারও কায করিতে করিতেই মহাপ্রয়াণ হইয়াছিল।

* স্বর্গীয় আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন। ভাঃ মঃ সঃ।

BENGAL LIBRARY 23 MAY 1906
IMPERIAL